এখন ডুয়ার্স

১৫-৩১ মার্চ ২০১৬। ১২ টাকা

এখন পাক্ষিক

হোলিতে এবার
খুশির রং নেই চা-বাগানে

বনমন্ত্রীদের দেশ ডুয়ার্সে বন কি আদৌ বাঁচবে?

ভোটের ঘণ্টা
ডুয়ার্স-তরাই রাজ্যে বিরোধীদের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ ভরসা

আড্ডাঘর
শুরু হল ডুয়ার্সের কফি হাউস

গতি হারাচ্ছে ডুয়ার্সের নদী
বিশ্ব জল দিবসে একান্ত সাক্ষাৎকারে কল্যাণ রুদ্র

আর মিলছে না সেই সব সুস্বাদু মাছ! আক্ষেপ মৎস্যজীবীদের

এই নদী, তুই খেই হারালি— হারিয়ে গেল জল?
হারিয়ে গেল মাছগুলো তোর কেমন করে বল?
রুপোর মতো বোরোলি মাছ রোদ্দুরে ঝিলমিল
তাকিয়ে ছিল মাছরাঙা বক ডাহুক এবং চিল
মন ভাল নেই সেই পাখিদের, তারাও হতবাক
হারিয়ে গেল চেপ্টি পুঁটি দাঁড়কা মাছের ঝাঁক!

নদীর কেন জল ফুরোল— কোথায় গণ্ডগোল?
তিনকাঁটিয়া খলশে চেলা ডেগরা মহাশোল
মেনিমুখো তেলচিটা চ্যাং কুরসা গুতুম কই
ঘাউরা পাঙ্গা কেকলে ট্যাপা— এই মাছেরা কই?
রাইচেং বা ভাগনাবাটা তিস্তা নদীর রুই
এমন স্বাদের মাছগুলোকে কোথায় পাবি তুই?

সরপুঁটি বা কুসুমা মাছ... গইচি কুচে বাইম...
মাছ দিয়ে যায় শব্দ আমায় লিখতে মেছো রাইম!
মাছ চলে যায় নিরুদ্দেশে, রুগ্‌ণ নদীর হাল
ব্যর্থ হয়ে উঠছে ডাঙায় অল্প জলের জাল!

ছন্দে অমিত কুমার দে

ছবিতে অমিতেশ চন্দ

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় বর্ষ, ১২/২ সংখ্যা, ১৫-৩১ মার্চ ২০১৬

এই সংখ্যায়

এখন ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের আড্ডাঘর চালু হল ৪
হোলিতে এবার রং মাখবে না ডুয়ার্স ৫
রাধা বিনা হোলি ৬

স্পেশাল ডুয়ার্স
বনমন্ত্রীদের 'দেশ' ডুয়ার্সে বন ও বন্যপ্রাণ কি আদৌ বাঁচবে? ৮

দূরবিন
উদয়ন জানতেন না রাজনীতিতে বাবার নামটাও ভুলতে হতে পারে! ১৬

ভোটের ঘণ্টা
বিরোধীদের শেষ ভরসার উত্তর ১৮

চায়ের কাপে চোখের জল
হোলিতে এবার খুশির রং নেই চা-বাগানে ১৪

প্রতিবেশী ডুয়ার্স
আফিম চাষে রেকর্ড ফলন প্রশাসনের প্রশ্রয়ে ২২
ফের ডাইনি অপবাদ : লজ্জায় মুখ ঢাকল মালদা ২৩

বিশ্ব জলদিবসে ডুয়ার্স
আমরা নষ্ট করে ফেলেছি নদীর গতিশীল ভারসাম্য ২৪
কোনও রাজনৈতিক দলের এতটুকু সদিচ্ছা কোনওদিন ছিল না ২৫
মাছ ধরার নামে যথেচ্ছাচার নদীর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে ২৬
চার-চারখানা জাল আমার, এখন এমনিই পড়ে থাকে ২৭
শহরের আবর্জনায় থমকে গিয়েছে পাগলাঝোরা ২৮
এ নদী কেমন নদী! ২৯

নিয়মিত বিভাগ
পাঠকের ডুয়ার্স ১০, ২১
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ১৩
খুচরো ডুয়ার্স ২০
প্রহেলিকার ডুয়ার্স ৩১
সংঘ সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৩৯
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪০
শখের বাগান ৪৫
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪৭

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩০
তরাই উৎরাই ৩২
ছিটমহলের ছেঁড়া-কথা ৩৪
লাল চন্দন নীল ছবি ৪১

ডুয়ার্সের গল্প
চুয়াপাড়ার চুড়েইল ৩৬

শ্রীমতী ডুয়ার্স
সমাজে শ্রীমতী ৪৪
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৫
টেক টক ৪৬
তক্কাতক্কি ৪৬
ভাবনা বাগান ৪৭

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে আমাদের ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

বাড়িতে বসে
'এখন ডুয়ার্স' পেতে চান ?

এখন ডুয়ার্স-এর পাঠকমহলে সাড়া ও চাহিদা দুই-ই বাড়ছে হু হু করে। এপ্রিল ১, ২০১৬ সংখ্যা থেকে জলপাইগুড়ির সঙ্গে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা ও শিলিগুড়ি শহরে বাড়িতে বা অফিসে নিয়মিত 'এখন ডুয়ার্স' পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও অন্যান্য এলাকাতেও শুরু হবে এই ব্যবস্থা।

যাঁরা 'এখন ডুয়ার্স' নিয়মিত পেতে চান তাঁরা আজই ফোন করে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নং লিপিবদ্ধ করান। পত্রিকা পৌঁছবে সঠিক সময়ে। পত্রিকার দাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এজেন্টের হাতে তুলে দিতে হবে। নতুবা এককালীন বার্ষিক গ্রাহক হয়ে তাৎক্ষণিক দাম দেওয়ার ঝামেলা বিদেয় করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ২৫০ টাকার বিনিময়ে বার্ষিক গ্রাহক হলে আপনি পাবেন ২৪টি সংখ্যার কুপন। পত্রিকা দিতে আসবেন যিনি তার হাতে কুপনটি ধরিয়ে দিলেই হবে।

আজই আপনার নাম, ঠিকানা গ্রাহক হিসেবে লিখিয়ে রাখুন। ফোন করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।

ডুয়ার্সের আড্ডাঘর চালু হল

ডুয়ার্সের মানুষ আড্ডাবাজ নয়— এ কথা কেউ কোনও দিন দাবি করেছিল কি? কলকাতার কফি হাউসের মতো এখানকার কলেজ ছাত্রছাত্রীরা, শিল্প-সাহিত্য-নাটক কিংবা রাজনীতির মানুষরাও চান এমন একটি আড্ডাস্থল, যেখানে চায়ের কাপ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। যৎসামান্য খরচাতেই। ডুয়ার্সের শহরগুলিতে এমনই আড্ডাঘরের অভাব বোধ করতেন সবাই। 'এখন ডুয়ার্স'-এর উদ্যোগে জলপাইগুড়ি শহরে সেরকমই প্রয়াস শুরু হল ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে। মার্চেন্ট রোডে মুক্তাভবনের দোতলায় বেলা এগারোটা থেকে রাত ন'টা অব্দি খোলা থাকবে এই আড্ডাঘর। প্রবেশমূল্য দু'জনের কুড়ি টাকা। ঘণ্টাখানেক বসার সঙ্গে মিলবে ডুয়ার্সের সুগন্ধি চা। সেই সঙ্গে মিলবে দিনের সব ক'টি বাংলা দৈনিক, আরও বইপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কী চাই? জনা পঞ্চাশের লোকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে আড্ডাঘরে। একটি কবিতাপাঠের আসর কিংবা একটি বই বা পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান বা একটি ডকুমেন্টারি বা একটি শর্ট ফিল্ম দেখাবার ব্যবস্থা করা যেতেই পারে অনায়াসে। যোগাযোগ- অমিতেশ ৯৭৩২০০০৬৬৫।

এমন একটি আড্ডাস্থল, যেখানে চায়ের কাপ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। যৎসামান্য খরচাতেই। ঘণ্টাখানেক বসার সঙ্গে মিলবে ডুয়ার্সের সুগন্ধি চা। সেই সঙ্গে মিলবে দিনের সব ক'টি বাংলা দৈনিক, আরও বইপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কী চাই?

হোলিতে এবার রং মাখবে না ডুয়ার্স

খুনখারাপির সঙ্গে বার্নিশের গুঁড়ো। একটু পোড়া মোবিল দিয়ে দুই তালুতে ঘষে নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। আরেকজন তৈরি থাকবে ব্যাটারির গুঁড়ো ঠোঙায় ভরে। এটা গত হোলির প্রতিশোধ। ওদের গায়ে গোবর জল ঢেলে চ্যাংদোলা করে নর্দমায় ফেলা হয়েছিল। এবার আসছে দিন। নির্জন আর নিরিবিলি এই গলির এক মুখ বড় রাস্তায়, আরেক মুখ মেজ রাস্তায়। মেজ রাস্তার মোড়ে আক্রমণ হবে। ওই আসে দুলাল। টার্গেট। সঙ্গে আসে আরও ক'জন। চলো! হোলি হ্যায়!!!

পাঁচজনকে ভূত বানাবার পর জানা গেল, একজন ওদের দলেরই নয়। ঘটনাচক্রে একই সময়ে একই স্থানে এসে পড়েছিল। সে যাচ্ছিল প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে। রং একটু মেখেছিল, তবে এমন ভয়ংকর জোম্বির মতো দেখাচ্ছিল না তাকে। এবার সে কী করবে? এ কি রঙের উৎসবে প্রিয়া-সাহচর্যে যাওয়ার মেকআপ?

কয়েক মিনিট বাক্য বিনিময়ের পর আরও দু'মিনিট গালাগালি এবং অবশেষে একটা ঘুসি দিয়ে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এই লড়াইতে সবাই পর্যাপ্ত কিল-ঘুসি-লাথি হজম করে রণে ভঙ্গ দিয়ে 'দেখে নেব' ইত্যাদি হুমকি দিয়ে কেটে পড়েছিল, কারণ কেউ কাউকে ঠিক চিনতে পারছিল না।

দোল তো এদিকে দু'দিনের। প্রথম দিন আবির আর পরের দিন মাখানো যায় এমন যা কিছু। সুতরাং দুলাল-বাহিনী আইনগত ত্রুটি নিয়ে এলাকার উঠতি নায়ক বড় স্বপনের সঙ্গে দেখা করল। দোলের প্রথম দিন এইসব রং নিয়ে আক্রমণের ব্যাপারটা যে আইনসম্মত হয়নি, বড় স্বপন সেটা বুঝতে পেরেও উষালগ্ন থেকে বঙ্গপানের কারণে উদার মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছিল প্রথমটায়। লগ্নভ্রষ্ট প্রেমিক তখন মোক্ষম চাল দিল। কাতর কণ্ঠে সে বলল, 'তুমি ছেড়ে দিতে বলো না স্বপনদা? যদি তুমি বউদির সঙ্গে দেখা করতে যেতে আর কেউ যদি তোমাকে ব্যাটারির কালি মাখাত?'

বড় স্বপন তড়িতাহতের মতো শিউরে সোজা হয়ে বসল। বিড়ি ধরিয়ে দিল, 'সন্ধ্যায় যখন বেরুবে, তখন চুবিয়ে দিবি। তারপর আমি দেখে নেব।'

এর পর যে সন্ধ্যা নাগাদ তেলেভাজা কিনতে এসে ছোটন গলির মধ্যেই পচা ডিম আর গোবর জলা ভরা বেলুনের সাক্ষাৎ পাবে, এতে আর আশ্চর্য কী! তবে ছোটন রাস্তার কলে স্নান সেরে ঘণ্টা দুয়েক পরে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে গৃহপ্রবেশ করে বাবাকে টুপি পরাতে পেরেছিল।

পরদিনই দোলের প্রথম লগ্নেই এলাকায় মহা উত্তেজনা। উক্ত প্রেমিকের প্রেমিকা, ক্লাস এইটের বুচিয়া ওরফে শিউলির মাথায় এক মগ গোবর জল ঢেলে ছোটন ভ্যানিশ। বুচিয়া যাচ্ছিল বাড়িল উলটো দিকে দণ্ডায়মান মালাই বরফবিক্রেতার কাছে। ছোটন সাইকেল চালিয়ে এসে চলন্ত সাইকেল থেকে কাজটি করে সাইকেলে চড়ে চলে যায়। মগটা অবশ্য ফেলে গিয়েছে। সেটা মুলি বাঁশের প্রবীণ ব্যবসায়ী পরিমল দাসের দোকানে জল খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত।

দোল-হোলিতে এমন দু'-একটা ঘটনা না ঘটলে ঠিক জমে না বলে ব্যাপারটা ক্ষমার চোখে বিবেচনা করা হল। ঠিক হল, যদি ছোটনকে পাওয়া যায়, তবে বুচিয়া তার মাথায় যেটা ইচ্ছা, সেটা ঢালবে। কিন্তু কাল থেকে এ নিয়ে আর কোনও কিছু চলবে না। কেবল বড় স্বপন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখল না। তার বিবেচনায় অমিতাভ বচ্চন এটা করতে পারে না। সে প্রেমিককে কোনও একটা সিনেমার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে, ক্ষত্রিয়ধর্ম কেন এখন আবশ্যক। প্রেমিক উজ্জীবিত হল। দুলালও।

তাই ছোটনকে খুঁজে বার করার প্রতিজ্ঞায় একটা সাইকেল নিয়ে বেরুল দু'জন। একজন দুলাল আর অপরটি উক্ত প্রেমিক। দু'জনেরই মুখ তখনও পরিষ্কার। হোলির দ্বিতীয় দিনে পথ চলতে গেলে এতটা পরিষ্কার থাকা যে অবৈধ, সেটা বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন দল তাদের বুঝিয়ে দিল। কত কী-ই না লিপ্ত হল তাদের মুখমণ্ডলে! ফলে প্রতিশোধ ব্যাপারটা গৌণ হয়ে গেল। গোটা শহরে রং মেখে জোম্বি হয়ে বিকেলের দিকে যখন ফিরল, তখন পাড়া স্তব্ধ। জনহীন। শেষ মাতালটাও ক্লাবঘরের সামনে বসে পড়েছে। বড় স্বপন বট গাছের বাঁধানো বেদিতে নাসিকাগর্জনে মগ্ন।

শুধু দু'জন গম্ভীর মুখে রাস্তার দু'পারে দণ্ডায়মান।

দু'জনের বাবা।

ওরা সাইকেল থামায়নি। আত্মবিশ্বাস বজায় রেখে দুই বাবার মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা বেয়ে ধীরগতিতে চলে গিয়েছিল নিরাপদ দিকে।

ওদের বাবারাও চিনতে পারে ন।

দু'সপ্তাহ পরে বুচিয়ার বিয়ে ঠিক হল পূর্ণিয়াতে। এতে প্রেমিককে খুব একটা দুঃখিত দেখায়নি। বিয়ে হয়েছিল শীতে। বর আসতেই বুচিয়ার বাড়ির মহিলারা যখন পাত্রপক্ষের উদ্দেশে আগমার্কা খিস্তি সুরে বসিয়ে গেয়ে শোনাচ্ছে, তখন কুয়োর পাড়ের বেড়ার গা ঘেঁষে দণ্ডায়মান ও বিড়িপানরত ছোটনের মাথায় একগুচ্ছ তরল এসে পড়ল। তরলের উপাদান ছিল ভাতের মাড়, জল, নষ্ট হয়ে যাওয়া ছোলার ডাল, ফিনাইল, কাপড় কাচার নীলের গুঁড়ো আর ঘুঁটের টুকরো।

অন্য দিন হলে দুলাল ঝগড়া জুড়ে দিত, কিন্তু বিয়েবাড়িতে বর আসার কারণে যে উচ্ছ্বাস ঝমঝম করছিল, সেটা দুলালকে সংযম পালনে বাধ্য করল।

আর শোনা গেল, বেড়ার ওপার থেকে ভেসে আসা দুলালের স্বর, 'শোধবোধ!' সঙ্গে একাধিক বালিকার কলকলে হাসি।

এর পরে বড় স্বপনের কাছে যাওয়ার আর কী থাকতে পারে!

বৈকুণ্ঠ মল্লিক

রাধা বিনা হোলি

মদনমোহন নামটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আম কোচবিহারবাসীর আবেগ। মদনমোহনের দোল উৎসবকে ঘিরে সেই আবেগ একটা অন্য মাত্রা নেয়। মদনমোহনের দ্বাদশ যাত্রার অন্যতম ও শেষ যাত্রা হল দোলযাত্রা। অথচ এই দোলযাত্রায়ও মদনমোহন একা, শ্রীরাধিকাবিহীন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে মদনমোহন বিগ্রহ কোচবিহার রাজবাড়ি থেকে মদনমোহন মন্দিরে স্থাপনের পর থেকে প্রাচীন রাজপ্রথা অনুসারে রাধাবিহীন দোলযাত্রা উৎসব প্রতি বছর একইভাবে পালিত হয়ে আসছে। ধর্মীয় প্রথা মেনে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে দোল উৎসব।

মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণর অষ্টোত্তর শতনামের একটি। লক্ষ করার বিষয়, কোচবিহার থেকে শুরু করে আসাম পর্যন্ত যেখানেই মদনমোহন আছেন, তাঁরা সকলেই রাধাবিহীন। রাধা না থাকার পিছনে অবশ্য নানা মুনির নানা মত। লক্ষণীয়, কোচবিহার মন্দিরে মদনমোহনের যে অষ্টধাতুর মূর্তি রয়েছে তা শ্রীকৃষ্ণর ছেলেবেলা অর্থাৎ নাড়ুগোপালের নয়। সেদিক থেকে ওই মূর্তির পাশে শ্রীরাধিকা থাকাই ছিল স্বাভাবিক। অথচ এদিককার কোনও মদনমোহনের পাশে রাধা নেই।

প্রসঙ্গত, কোচবিহার রাজবংশ ছিল শৈব বংশ। তারা শিবের উপাসক হলেও মা ভবানী হচ্ছেন এই রাজবংশের ইষ্টদেবী। শংকরদেবের প্রভাবে পরবর্তীতে মহারাজ নরনারায়ণ বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হন। অনেকে মনে করেন, যেহেতু শংকরদেবের বৈষ্ণবমতে এখানে মদনমোহন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাই মদনমোহনের সঙ্গে রাধা নেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে হলে রাধা থাকতেন। কিন্তু আসল কারণ অনেক গভীরে। তন্ত্রমতে ভারতে চারটি সিদ্ধপীঠ রয়েছে— জ্বালামুখী, কামাখ্যা, কন্যাকুমারী ও বিমলা (জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্র)। পুরীর জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্র বা বিমলা পীঠের পুজোপদ্ধতির সঙ্গে মদনমোহনের পুজোর অনেক মিল রয়েছে। কোচবিহার কামরূপ বা কামতাপুর, কামাখ্যা সিদ্ধপীঠের অন্তর্গত। কোচ রাজারা শিববংশসম্ভূত এবং কামাখ্যা মায়ের আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তন্ত্রশাস্ত্রের স্রষ্টা স্বয়ং শিব। সেই মতে কোচবিহার রাজ্যে ভবানীদেবী হচ্ছেন ভৈরবী এবং মদনমোহন হচ্ছেন ভৈরব (শিবস্বরূপ)। ঠিক যেমন জগন্নাথদেব শ্রীক্ষেত্রে বিমলাদেবীর ভৈরব। সেখানেও জগন্নাথের লক্ষ্মী বা রুক্মিণী নেই। মদনমোহনেরও রাধা নেই। শংকরদেব এই তত্ত্বটি জানতেন। কামরূপ সিদ্ধপীঠের কোথাও তিনি মদনমোহনের সঙ্গে রাধাকে রাখেননি। যেখানে সিদ্ধপীঠ নেই, সেখানেই একমাত্র মদনমোহনের সঙ্গে রাধাকে দেখতে পাওয়া যায়।

মদনমোহনের সিংহাসনের নিচে লক্ষ করলে দেখা যায়, মা ভবানীর যে কষ্টিপাথরের মূর্তিটি মহারাজা বিশ্বসিংহ পেয়েছিলেন, সেটিকে মদনমোহনের সিংহাসনের বাঁ দিকে রেখে পুজো করা হয়। আর মদনমোহনের নিত্যপূজা হয় শ্রীকৃষ্ণর পূজাপদ্ধতি অনুসারেই। হয়ত সেই কারণেই দোল থেকে রাসযাত্রা— প্রায় সব উৎসবই হয় ওই প্রথা অনুযায়ী। রাধার অস্তিত্ব এ ক্ষেত্রে খুব বেশি জরুরি হয়ে ওঠে না। মদনমোহনই সেখানে

রাজ-আমল থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। সে সময় মহারাজা প্রথম আবির দিলেও বর্তমানে এই কাজটি করেন কোচবিহার রাজবাড়ির দুয়ারবক্সী অমিয় দেব বক্সী। তিনিই পলাশ-তোলা পুজোর আবির প্রথম মদনমোহনের পায়ে দেন। এর পর অন্য সবাই। রাজপুরোহিত ভেড়ার ঘর পোড়ানোর জন্য বাঁশে আগুন দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেন।

একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনিই নায়ক।

কোচবিহারের সাধারণ মানুষ দু'দিন ধরে দোল খেললেও মদনমোহনের দোল উৎসবতিথি মেনে প্রায় পাঁচ দিন ধরে চলে। এই দিনগুলিতে তিনি বাইরের বারান্দায় পূজিত হন। অবশ্য এর সূচনা হয় এক মাস আগে থেকে, শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে পলাশ তোলা পুজোর মাধ্যমে। সে দিন বিশেষ পুজোর জন্য পলাশ ফুল ও আবির তুলে রেখে দেওয়া হয়। দোলের সময় সেটাই মদনমোহনকে প্রথম দেওয়া হয়। এর পরের পূর্ণিমা তিথিতে দোলযাত্রার বাঁশ রোপণ অনুষ্ঠান হয় বহ্ন্যুৎসবের জন্য। দোলপূর্ণিমার আগের দিন হয় এই বহ্ন্যুৎসব। একে বুড়ির ঘর পোড়ানো বা ভেড়াসুর বধ বলে, কেউ আবার ভেড়াপোড়াও বলে থাকেন। সে দিন সন্ধ্যায় মদনমোহন কড়া পুলিশি প্রহরায় বাদ্যযন্ত্র সহকারে শোভাযাত্রা করে যাবেন স্থানীয় রাসমেলার মাঠে। রাজমাতা মন্দিরের রাধামাধব, ডাঙরআই মন্দিরের বিনোদবিহারী ছাড়াও মদনমোহনের আশপাশ বা দীনদয়াল ও রাধারমণকে নিয়ে চৌদলে চেপে মদনমোহন স্বয়ং যাবেন বহ্ন্যুৎসবে যোগ দিতে। সেখানে আগে থেকেই তৈরি করা থাকে ছন ও বাঁশের ছোট ছোট অস্থায়ী পাঁচটি ঘর। প্রথমে সেই ঘরে বিগ্রহদের পুজো করে সকলকে বাইরে নিয়ে এসে এক সারিতে বসানো হয়। তারপর প্রথম আবির দেওয়া হয় মদনমোহনকে।

রাজ-আমল থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। সে সময় মহারাজা প্রথম আবির দিলেও বর্তমানে এই কাজটি করেন কোচবিহার রাজবাড়ির দুয়ারবক্সী অমিয় দেব বক্সী। তিনিই পলাশ-তোলা পুজোর আবির প্রথম মদনমোহনের পায়ে দেন। এর পর অন্য সবাই। রাজপুরোহিত ভেড়ার ঘর পোড়ানোর জন্য বাঁশে আগুন দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। দাউদাউ করে পুড়তে থাকে ঘর। আগুনের চারপাশে পাঁচটি চতুর্দোলায় বিগ্রহদের সাতবার পরিক্রমা করানো হয়। বাদ্যযন্ত্রের তুমুল ধ্বনিতে সে এক অভাবনীয় রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন। রাসমেলার মাঠে দর্শনার্থীদের ঢল নেমে আসে। আগুন প্রদক্ষিণের পরই মদনমোহনসহ বিগ্রহরা পুনরায় যে যার মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হন। ওই রাতেই মদনমোহনের দোলযাত্রা, পুজোর অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। অধিবাসের পরে হয় সন্ধি দোল। অনেক রাত অবধি চলে এই পুজো। আর মদনমোহনও ব্যস্ত হয়ে যান দোল খেলায়।

পরের দিন থেকে মদনমোহনকে

সুসজ্জিত করে পঞ্চম দোল পর্যন্ত মন্দিরের বারান্দায় রাখা হয়। দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে হয় বিশেষ পুজো। এ দিন কোচবিহারবাসী পুজো দিতে ভিড় করেন মদনমোহন মন্দিরে। সকলে আবির দেন তাঁদের প্রিয় মদনমোহনকে। সে দিন শুধু ভগবানের সঙ্গে ভক্তের খেলা। কোচবিহারের বাতাসে তখন শুধু আবিরের গন্ধ। দোলযাত্রার পরের দিন হয় দোল সোয়ারি। অর্থাৎ সমস্ত দেবতার আবির খেলা। এ দিন সকাল থেকে কোচবিহারবাসী মেতে ওঠেন দোল উৎসবে। দোলের রঙে রঙিন হয়ে ওঠেন সবাই। আবির, পিচকিরি আর জলরঙে সারাদিন ধরে চলে হোলি খেলা। বিকেলে ছোট ছোট বাচ্চার দল রাধাকৃষ্ণ সেজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ-গান করে।

সে দিন সন্ধ্যায় দোল সোয়ারির জন্য বাণেশ্বর থেকে বৃষসহ চলন্ত বাণেশ্বর, তুফানগঞ্জের ষণ্ডেশ্বর থেকে ষণ্ডেশ্বর শিব, ডাঙরআই, রাজমাতা মন্দিরের বিগ্রহদের সকলকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হয় রাসমেলার মাঠে। আগে প্রাচীন রীতি মেনে কোচবিহারের বেশ কয়েকটি বাড়ির মদনমোহন বিগ্রহ ওই দিন চৌদলে করে দোল সোয়ারিতে আসত। এখন একমাত্র দিনহাটা রোড থেকে জগন্নাথ গোপীনাথ বিগ্রহ আসেন চৌদলে চেপে। সেখানে বিগ্রহদের সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে আবির দেন দুয়ারবক্সী। ভক্তরাও বাদ পড়েন না। এর পর আবার বিগ্রহদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিজ নিজ মন্দিরে। শুধুমাত্র বাণেশ্বর ও ষণ্ডেশ্বর শিব মদনমোহন মন্দিরের কাঠামিয়া মন্দিরে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন বিকেলে তাঁদের পুজো ও ভোগ নিবেদনের পর তাঁরা আবার পুলিশি প্রহরায় নিজ নিজ মন্দিরে ফিরে যান। তিথি অনুযায়ী পঞ্চম দোলে ফের মদনমোহনকে আবির দিয়ে দোল উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। সে দিন সন্ধ্যারতির পর মদনমোহন ফিরে যান তাঁর নিজ কক্ষে।

বর্তমানে কোচবিহারের দুয়ারবক্সী অমিয় দেব বক্সী এই প্রথা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। কারণ, প্রথামতো রাজার পরিবর্তে বিভিন্ন পুজোয় রাজপ্রতিনিধি হিসেবে প্রথম কাজটি তিনিই করে আসছেন। এখন তিনি অশীতিপর। বয়সজনিত দুর্বলতা তো আছেই। তা ছাড়া তিনি ও তাঁর ভাই ছাড়া পরবর্তী প্রজন্মে কোনও পুত্রসন্তান নেই। সেই কারণে ভবিষ্যতে এই প্রথা কীভাবে টিকে থাকবে, কে করবে তা-ই নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত এই রাজপ্রতিনিধি। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড এত বছর ধরে প্রাচীন রীতি মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে এইসব প্রথা পালন করে আসছে। বর্তমান বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীনও হতে হচ্ছে তাঁদের। কর্মীদের বেতন সমস্যা থেকে শুরু করে স্বয়ং মদনমোহনের নিত্যপূজায় অর্থের অভাব, যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তবুও নানা সমস্যা সত্ত্বেও মদনমোহনের অন্যান্য যাত্রাসহ দোলযাত্রা যেভাবে হয়ে আসছে, আগামীতেও ঠিক সেভাবেই পালন হবে বলে দাবি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

বনমন্ত্রীদের ‘দেশ’ ডুয়ার্সে বন ও বন্যপ্রাণ কি আদৌ বাঁচবে?

পুরনো ডুয়ার্স জঙ্গলের চেহারা দু’-চার বছরেই ফিরিয়ে আনা যাবে না

ডুয়ার্সের অরণ্যসম্পদ ধ্বংস হয়েছে— এ কথা সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া খুবই কষ্টদায়ক। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি যা, তাতে অস্বীকার করা যাবে না যে, কী বিপুল সম্পদের ক্ষতিসাধন ঘটেছে ডুয়ার্সের জঙ্গলে। গত শতাব্দীর সাতের দশকে এবং শেষ দিকেও ডুয়ার্স অরণ্যের যে ব্যাপ্তি, ঘনত্ব এবং সম্ভার ছিল তা আজ আর নেই। ডুয়ার্সের জঙ্গলকে ধ্বংস করা হয়েছে। সেই ধ্বংসের কাজ শুরু হয়েছিল গত শতকের আটের দশকের গোড়ায়। জঙ্গলের গাছ কেটে রাতারাতি জঙ্গল সাফ থেকে শুরু করে অবৈধ পথে কাঠ পাচার— সবরকম বেআইনি কারবারই রমরমিয়ে চলেছে ডুয়ার্সের জঙ্গলে। জলাভূমি বুজিয়ে বেসরকারি হোটেল, রিসর্ট তৈরিতে মিলেছে দেদার ছাড়পত্র। রাস্তা তৈরির নামে, রাস্তা চওড়া

করার অজুহাতে রাতারাতি কাটা পড়েছে অসংখ্য আকাশচুম্বী গাছ। অথচ ডুয়ার্সের কোনও উন্নয়নই তখন হয়নি। একমাত্র জঙ্গল ধ্বংস ছাড়া। আজ যে জলদাপাড়া, গোরুমারা, চিলাপাতা, কালচিনি, চাপড়ামারি, মেন্দাবাড়ি, নিমতি, জয়ন্তি— প্রায় সব জঙ্গলের পরিমাণ কমেছে, তার সূচনা ওই সময়েই। জঙ্গলের উপর তিন দশক যাবৎ অত্যাচারের ফলে কোর এরিয়ার খাদ্য-খাদক সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। বনের জীবজন্তুরা মানুষের কাছাকাছি চলে এসেছে। প্রতিনিয়ত মানুষ আর জানোয়ারের

সংঘাত লেগেই আছে। বনে খাদ্যের নিদারুণ অভাব, ফলে বন্য প্রাণীরা ঢুকে পড়ছে খাবারের খোঁজে। আমার লক্ষ্য ছিল সবুজায়ন বৃদ্ধি করা। প্রচুর পরিমাণ গাছ লাগানো হয়েছে। সে কাজ পুরোদমে চলছে। বনে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, সে ব্যবস্থাও প্রায় সর্বত্র করা হয়েছে। অবৈধভাবে গাছ কাটা এবং চোরাই পথে পাচার বন্ধ করাটা জরুরি ছিল, সেটাও নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে অনেকটাই। ফলে গাছ, হাতির খাদ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ গাছও লাগানো হচ্ছে। পুরনো ডুয়ার্স জঙ্গলের চেহারা দু’-চার বছরেই ফিরিয়ে আনা যাবে না ঠিকই, তবে আগামী কয়েক বছর এইভাবে বন সংরক্ষণ এবং সৃজনের কাজ চালানো গেলে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি সাফারি পার্ক চালু করেছেন, ওই ধরনের আরও একটি-দু’টি শুরু হলে জঙ্গলের উপর পর্যটনের চাপ কমবে। পর্যটনের উপর ডুয়ার্সের অর্থনীতি নির্ভরশীল, তার উন্নয়ন আটকানো যাবে না। জঙ্গল থেকে বনবস্তি উচ্ছেদ করে ফেলাও সম্ভব নয়। কিন্তু আর যাতে না বাড়ে, সেদিকে নজর রাখছি। বনবস্তির মানুষদের বন্য প্রাণীদের জীবনযাপন সম্পর্কে সচেতন করার প্রচারমূলক কাজ তো চলছেই। পশুদের জায়গায় মানুষ দখল নিলে সংঘাত অনিবার্য। কিন্তু যাঁরা জঙ্গলের কাছাকাছি বসবাস করছেন বা বনের জমিতে বাস করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া মুশকিল। অরণ্য ধ্বংস অনেকটাই প্রতিরোধ করা গিয়েছে। আরও সময় লাগবে।

বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, বনমন্ত্রী

ডুয়ার্সের জঙ্গল ও বন্যপ্রাণ বাঁচাতে হলে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে

ডুয়ার্সের জঙ্গল কমেছে। জঙ্গলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। নদীনালাগুলির অবস্থাও খুব সঙিন— এটা ঘটনা। কিন্তু শুধু তার সমালোচনা করলে তো সেই অবস্থার পরিবর্তন হবে না। আসল কথা হল, জঙ্গলকে রক্ষা করতে হবে। নদ-নদী-ঝোরাসহ সমগ্র জলক্ষেত্রকে বাঁচাতে হবে। এটা শুধুমাত্র কাগজে-কলমে কিংবা আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। বন বাঁচাতে আরও গাছ লাগাতে হবে। বৃক্ষসৃজনের মধ্যে শাল-সেগুন-অর্জুন-শিরীষ যেমন রয়েছে, তেমনই জোর দিতে হবে ফল ও পশুখাদ্যের গাছ লাগানোতে। এক সময় ডুয়ার্সের জঙ্গলের যে গভীরতা-ঘনত্ব ছিল তা কমেছে। এ কথার মানে শুধু সমালোচনা নয়। বন বাঁচানোর, সংরক্ষণের যে উদ্যোগ চলছে, তার বিরোধিতা করাও নয়। যেসব গাছ অল্প বৃষ্টিতে খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, সেইসব গাছ লাগাতে হবে, যাতে অরণ্যের ফাঁকা জায়গাগুলি খুব দ্রুত ভরাট হয়। বনসংরক্ষণের কাজ চলছে। বনসম্পদ রক্ষা থেকে শুরু করে জীববৈচিত্রকে সুরক্ষা দেওয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবেশবিদ, পরিবেশপ্রেমী এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে আরও কাজ করতে হবে। নজরদারি বাড়াতে হবে। বেআইনি পথে গাছ কাটা, কাঠ পাচার বন্ধ করার জন্য নিয়মনীতি আরও কড়া হওয়া দরকার। বন দপ্তর কর্মীর অভাব, পরিকাঠামোর দুর্বলতা ইত্যাদি অজুহাত দিয়ে থাকে। এ ধরনের কথা আসলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, নিজেদের না-পারাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য। প্রতিনিয়ত ডুয়ার্সের নানা জায়গায় মানুষের এলাকায় হাতি, চিতা বাঘ, বাইসন ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটে। আসলে পশুদের অরণ্যে ভাগ বসিয়ে ফেলছে মানুষ। জঙ্গলেও পশুদের খাদ্যে টান পড়েছে, তাই বন্য প্রাণীরাও মাঝেমধ্যে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। তাদের পিছনে ধাওয়া করছে হাজার হাজার মানুষ। তারা পালাবার পথ পাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতনতার পাঠ দিতে হবে। বন্য জন্তুদের সঙ্গে মানুষের সংঘাত কাম্য নয়। বন উন্নয়ন দপ্তর-এর কাজের এক্তিয়ার সীমিত। তারা সরাসরি বনসংরক্ষণ অথবা বন্য প্রাণ সংরক্ষণের কাজের পরিকল্পনা কিংবা উদ্যোগ নিতে পারে না। তারা সে কাজে সব সময়েই সহযোগী। তবে বনে বা পশুদের বাসভূমিতে ক্রমশ যে মানুষের হানাদারি চলছে, তাকে প্রতিরোধ করতে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। তা না হলে বন্য প্রাণীরা তাদের বাসভূমি থেকেই উচ্ছেদ হয়ে যাবে। লোকালয় সীমা যাতে আর বনাঞ্চলে বিস্তৃত না হতে পারে, তার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন দপ্তরকে উদ্যোগী হয়ে প্রশাসনের তরফে নিয়মনীতি তৈরি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সামনে সংকট গুরুতর, তার আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা জরুরি।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, চেয়ারম্যান,
বন উন্নয়ন নিগম

বিশ্ব অরণ্য দিবসের প্রশ্ন

ডুয়ার্সে আজ অস্তিত্বের লড়াইয়ে মানুষ বনাম জঙ্গল সমাধানের পথ নেই?

- বন দপ্তরের কর্মীবল অভাবের অজুহাত চিরকালীন।
- নেপাল-বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ অব্যাহত— ফলত জনস্ফীতি— লোকালয় সম্প্রসারণ ঘটছে দ্রুত।
- ইকো টুরিজম অরণ্য রক্ষায় একটি বড় হাতিয়ার, কিন্তু এ রাজ্যে কতটা কার্যকরী হয়েছে?
- বন উন্নয়ন নিগম বা পর্যটন উন্নয়ন নিগম আদৌ কোনও সহায়তা করতে পারে?
- বছরে কয়েক'শ বা হাজার গাছ লাগিয়ে ডুয়ার্সের জঙ্গল বাঁচানো যাবে কি?
- বন সংরক্ষণ-এর কাজে স্থানীয় এনজিও-দের আদৌ কতটুকু কাজে লাগানো হচ্ছে?

কঠিন পদক্ষেপ ছাড়া উপায় নেই কিন্তু কে নেবে সেই কড়া মনোভাব?

ডুয়ার্সের বনসুরক্ষা, বনজ সম্পদ সংরক্ষণে বর্তমান সরকার চূড়ান্তভাবে উদাসীন। ডুয়ার্সের জঙ্গল ছিল গভীর। বহু ধরনের ছোট-বড়-মাঝারি গাছের ঘন জঙ্গল। আজ সে জঙ্গলে চরম দারিদ্র বিরাজ করছে। বাইরে থেকে সবুজ চেহারা চোখে পড়ে ঠিকই, কিন্তু ভিতরটা ফাঁকা। জঙ্গলে বন্য প্রাণী বিপন্ন। চরম খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। পশুদের জায়গা দখল করেছে বনবস্তি-লোকালয়। প্রতিনিয়ত মানুষের সঙ্গে বন্য প্রাণীর সংঘাত চলছে। বন্য প্রাণীদের উপর নানাভাবে আক্রমণ শানাচ্ছে মানুষ। যথেচ্ছভাবে জঙ্গলের গাছ কাটা পড়ছে। বেআইনি পথে সেই কাঠ পাচার হচ্ছে। চোরাশিকারিদেরও বাড়বাড়ন্ত। এসব কিছুর কারণ প্রশাসনের উদাসীনতা। যেখানে সরকারিভাবে তৎপরতা এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, সেখানে তারা ভীষণভাবেই শিথিল। ফলে অরণ্যনিধন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, ডুয়ার্সের প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্যই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

চোরাপাচার ডুয়ার্সের জঙ্গলে এখনও হামেশাই ঘটছে। কেবল হাতি গন্ডারই নয় হত্যা করা হচ্ছে অন্যান্য ছোট ছোট বন্যপ্রাণ।

আমাদের সময় ছিল বনসুরক্ষা কমিটি। প্রতিটি বনাঞ্চলে বনসুরক্ষা সমিতিগুলিকে সক্রিয় রাখায় চোরাকারবারিদের প্রতিরোধ করা গিয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে জনমত গড়ে তোলা গিয়েছিল। সেই সঙ্গে বন ও বনসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর কাজও চলত। আমি দায়িত্ব নিয়ে চালু করেছিলাম ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটি। পর্যটন তখন অন্য এক মাত্রা পেয়েছিল। তাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য যেমন বজায় থাকত, তেমনি অরণ্যবাসী মানুষের কাজেরও সুযোগ ঘটেছিল। বন ও বন্য প্রাণ সম্পর্কে তাদের সচেতন করার কাজ চলত সমান তালেই। যথেচ্ছভাবে জঙ্গলে রিসর্ট, পাকা বাড়ি নির্মাণ, সাফারি এবং জনস্রোতের মতো পর্যটকদের ভিড়ে বনে দূষণ বেড়েছে মাত্রাতিরিক্ত। বন্য পশুরাও কোণঠাসা। হাতি চলাচলের ছাড়পথে সুরক্ষা ছাড়াই চলাচল করছে রেল। সমস্তরকম অব্যবস্থায় ডুয়ার্স তথা ডুয়ার্সের বন্য প্রাণ আজ ভীষণ বিপদগ্রস্ত।

পর্যটকদের জন্য ডুয়ার্স ভ্রমণের পরিকল্পনায় শুধু সাফারি কেন? পর্যটনে প্রকৃতি দর্শন থেকে শুরু করে কোচবিহার রাজবাড়ি-মন্দির ইত্যাদি রাখা গেলে বনের উপর চাপ অনেকটা কমে। প্রচুর সংখ্যক মানুষ একসঙ্গে গাড়ি সমেত জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারে না। তাতে পর্যটনের উন্নয়নে কোথাও তো ফাঁক পড়ে না। ডুয়ার্স ভ্রমণ মানে কি জঙ্গলে ভিড় বাড়িয়ে দেওয়া, যত্রতত্র রিসর্ট, রাতে আলো জ্বালিয়ে উদ্দাম বিনোদন? বনবস্তিগুলির মানুষের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে তাদের ধীরে ধীরে অন্যত্র সরাতে হবে। এখনই বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। বন্য প্রাণীর প্রজনন প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও বাধা না পড়ে, বনের মধ্যেকার তৃণভূমিতে যাতে গৃহপালিত পশুরা অবাধে প্রবেশ না করে, সেদিকে কঠোর নজর রাখতে হবে। অবৈধ করাতকলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু কারা নেবে এই সিদ্ধান্ত? প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। অবস্থা ক্রমশ খুব খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কে নেবে সেই কড়া মনোভাব?

যোগেশ বর্মন, প্রাক্তন বন মন্ত্রী

সব থেকে আগে দরকার শিক্ষা ও সচেতনতা

ডুয়ার্সের জঙ্গল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে— এ কথা মানতে পারব না। এমনকি, সেই জঙ্গল ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, সে কথাও আজ পুরোপুরি সত্যি নয়। জঙ্গলের বৈশিষ্ট্য সর্বত্র সমান নয়। তা ছাড়া সরকারি রিপোর্টও তো জঙ্গল ধ্বংস কিংবা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা বলছে না। বন্য প্রাণীর সংখ্যাও বেড়েছে। তবে এ কথা ঠিক, জঙ্গলে বনবস্তির সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। জঙ্গল সীমানায় ঢুকে পড়েছে মানুষ। ফলে প্রতিনিয়ত বন্য প্রাণীর সঙ্গে ঘটছে সংঘাত। তেমনই গভীর জঙ্গলের অনেক জায়গাই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বন দপ্তর লাগাতার সৃজন প্রকল্প চালিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে চলেছে। অনেকাংশেই সে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। তবে গাছ লাগানোর কাজ আগামী দিনেও ব্যাপকভাবে চালাতে হবে। এ ক্ষেত্রে আরও বহু বনকর্মীর দরকার, যে অভাব প্রতিনিয়ত প্রকট। তবে স্বল্প সংখ্যক বনকর্মী দিয়েও বনসংরক্ষণ, বনরক্ষা, নজরদারি, বন ও বন্য প্রাণী নিয়ে প্রচারধর্মী কাজ চলছে। এ ধরনের কাজে নানারকম সমস্যা রয়েছে। সেগুলি ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন।

পাশাপাশি হাতির খাদ্যতালিকায় থাকা গাছপালার সংখ্যা বেড়েছে, এমনকি পাখিদের ফল ও অন্যান্য বন্য প্রাণীর খাবারও। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ আর পশুর সংঘাত ঘটছে, বিশেষ করে হাতি, চিতা আর বাইসন হানা দিচ্ছে লোকালয়ে। বন দপ্তর থেকে লাগাতার সচেতনতার প্রকল্প চলছে। বনবাসীদের বন্য প্রাণীর স্বভাব, খাদ্যাভ্যাস, চলাফেরা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হচ্ছে। বনের কাছাকাছি থাকলে জীবনযাপনের ধারা কেমন হওয়া উচিত, চাষাবাদ, খাদ্য সংরক্ষণ, হাড়িয়া মজুত করার ব্যাপারে তাদের সচেতন করা হচ্ছে। বন্য প্রাণী ঢুকে পড়লে তাদের ঘিরে ধরে উল্লাস নয়, পালানোর পথ করে দেওয়া— এসব বিষয়ে ধারণা তৈরি করা হচ্ছে। কর্মীসংখ্যা প্রায় শূন্য, তা দিয়ে কাজ যত দূর সম্ভব চলছে। জঙ্গল সংরক্ষণ, বনরক্ষা, পশুর সঙ্গে সংঘাত এড়ানো — এইসব ক্ষেত্রে আমি সচেতনতা বাড়ানোর কাজকে অগ্রাধিকার দিই। সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানে বনের উপর নির্ভরশীল মানুষ প্রচুর। বহু যুগের জীবনধারা আচমকা রোধ করার চেয়ে তাদের মধ্যে সব থেকে আগে শিক্ষা অর্থাৎ চেতনা জাগানো দরকার। পরবর্তীতে দেখা যাবে, তারাই বনরক্ষায় সব থেকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। বনের উপর তাদের অধিকার যে বেশি, সে কথা তো অস্বীকার করা যাবে না।

সুমিতা ঘটক, বনপাল, উত্তর শাখা

হাতিরালয়ে মানুষের হানা

শিলিগুড়ির পর জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের আমবাড়ি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দু'-দু'বার লোকালয়ে হাতির হানা। শিলিগুড়িতে প্রাণহানি না হলেও শিলিগুড়ি লাগোয়া আমবাড়িতে কিন্তু একজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে লোকালয়ে হাতি ঢুকে পড়ার ঘটনায় বনবস্তি ও আশপাশ এলাকায় চরম উদ্‌বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও এই ধরনের ঘটনা ডুয়ার্সের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়। বিগত কয়েক বছরে লোকালয়ে হাতি ঢুকে পড়া কিংবা বন্য জন্তুদের হানার ঘটনা ঘটেছে বহুবার। সব ক্ষেত্রেই প্রাণহানি ঘটেনি, তবে তাণ্ডব কখনও কখনও মারাত্মক আকার নিয়েছে। মানুষের ঘরবাড়ি থেকে খেতখামার— সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিপুল। প্রবল চাপে হাতিসহ বন্য প্রাণীর হানা রুখতে বন দপ্তর মাঝেমধ্যেই একাধিক উদ্যোগের কথা বলেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই উদ্যোগ কোথায় কীভাবে হয়েছে তা ডুয়ার্সের মানুষ কিংবা বনবাসী অথবা জঙ্গল লাগোয়া বস্তিবাসীরা কেউ মনে করতে পারেন না। তবে যখনই এ ধরনের ঘটনায় বন দপ্তর সমালোচনায় পড়ে, তার পরমুহূর্তেই শোনা যায়, হাতির হানা সামাল দিতে তারা একাধিক উদ্যোগ নিতে চলেছে।

সম্প্রতি দু'টি ঘটনার পরও বন দপ্তরকে প্রবল চাপের সামনাসামনি হতে হয়েছে। আর যথারীতি আগের মতোই বন দপ্তর একাধিক উদ্যোগের কথা জাহির করেছে। তবে এবার হাতির হানা সামাল দিতে 'কুইক রেসপন্স টিম' তৈরি করার কথা জানিয়েছে খোদ রাজ্য সরকার। গত ২০ ফেব্রুয়ারি হিলকার্ট রোডে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে বৈঠক করে 'কুইক রেসপন্স টিম' তৈরির খবর জানান মন্ত্রী গৌতম দেব। বিধানসভা ভোটের আগে শাসকদল নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতেই এ ধরনের উদ্যোগের কথা বলছেন বলেই অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। যদিও এই প্রসঙ্গ একাধারে রাজনৈতিক, সেই সঙ্গে বিতর্কের তো অবশ্যই। সেই আলোচনা ও বিতর্কের অবতারণা করার অবকাশ এখানে নেই। তবে এই প্রশ্ন তো রাখাই যায়, হাতি বা বন্য প্রাণীরাই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে, নাকি তাদের জমিতেই মানুষ দখলদারি চালাচ্ছে?

যে দিন থেকে নগর সম্প্রসারণের কারণে অরণ্য ধ্বংস শুরু হয়েছে, বলা যায়, সে দিন থেকেই ডুয়ার্সের লোকালয়ে হাতি বা অন্য বন্য পশুদের ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটছে। তারপর যত দিন এগিয়েছে, সভ্য নাগরিকদের ঘরদোর, জমিজিরেতের সীমা বাড়তে বাড়তে জঙ্গল এলাকায় ঢুকে পড়েছে। আধুনিক সমাজ-সভ্যতার ভাষায়, বন দখল করে গড়া বসতির নামকরণ করা হল বনবস্তি। বন্য প্রাণীদের কোর এলাকা দখল করে সভ্য নাগরিকদের অরণ্য প্রমোদভবন গড়ার নাম দেওয়া হল রিসর্ট। তা ছাড়া অরণ্যে বন্য জন্তু দেখতে সভ্য নাগরিকদের ভিড় তো ক্রমশই বাড়ছে। সাফারির নামে জঙ্গলে রাশি রাশি গাড়ি ছুটছে সশব্দে। আর বন্য জন্তুরা প্রাণ বাঁচাতে ক্রমশই পিছু হটছে। এর পরও কিন্তু আমরা বলে চলেছি, লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে হাতি। শুধু তা-ই নয়, বন দপ্তরও বলছে, লোকালয়ে হাতির হানা রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রায়শই তারা ঘোষণা করছে এক বা একাধিক প্রকল্প। সেইসব ব্যবস্থা বা প্রকল্প আদৌ বাস্তবায়িত হল কি না

মানুষ বনাম বন্যপ্রাণ : সংঘাত চরমে

লোকালয়ে হাতি-বাইসন-লেপার্ড — এখন নিত্য ঘটনা।

ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু— কোনও সমাধান সূত্র মেলেনি এখনও।

অথবা তার কার্যকারিতায় কতটুকু ফল মিলল, সে প্রশ্ন ভিন্ন। কিন্তু খোদ বন দপ্তরই বা হাতিদের কোণঠাসা করে দেওয়ার কথা বলছে কোন যুক্তিতে?

আজ নিজের বাসভূমেই উদ্‌বাস্তু হয়ে পড়েছে জঙ্গলের আদি বাসিন্দা হাতি। জঙ্গলে গাছ নেই। জঙ্গলে হাতির খাদ্যও প্রায় শেষ। আয়তন কমছে প্রতিটি মুহূর্তে। একদিকে ধেয়ে আসছে মানুষের বসতি। অন্য দিক থেকে নগরায়ণের দূষণ গ্রাস করছে জঙ্গলকে। অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, সভ্য নাগরিকরা তাদের আলয়ে অন্যের প্রবেশাধিকারকে অবৈধ মনে করে। অথচ তারাই কিন্তু পশুদের বাসভূমে ঢুকে পড়ে নিজেদের বসতি স্থাপন করেছে। এখনও করছে। এতে শুধু অরণ্যের প্রাচীন বাসিন্দারা যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে তা-ই নয়, তারা বহু ক্ষেত্রে নির্মূলও হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমরা বলেই চলেছি লোকালয়ে হাতির হানা। আড়াল করছি নগরায়ণের প্রকোপে, প্রশাসনিক উদাসীনতায় কীভাবে ধ্বংস হয়ে চলেছে ডুয়ার্সের অরণ্যসম্পদ। আর তার জেরে বন্য প্রাণীদের পরিস্থিতি কতটা প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছে। সরকারি সমীক্ষাই বলছে, জলদাপাড়া, গোরুমারা, চিলাপাড়া, মেন্দাবাড়ি, নিমতি, জয়ন্তি, কালচিনি, চাপড়ামারিসহ বহু অঞ্চলের জঙ্গলের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে দ্রুতগতিতে। পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়ছে হু হু করে। কমে যাচ্ছে বৃষ্টিপাত। ১৪ থেকে ২০ জুলাই ঘটা করে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়। গাছের চারা বিতরণ করা হয়। সরকারিভাবে গাছও লাগানো হয়। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই সেই গাছগুলির চেহারা কোথায় যে উধাও হয়ে যায়, কেউ তার খোঁজ জানে না। গাছ লাগানোর অনুষ্ঠানের জন্য যে তোড়জোড় দেখা যায়, সেগুলি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বন দপ্তর সম্পূর্ণ উদাসীন কেন? সম্প্রতি লক্ষ করা গেল, সমগ্র ডুয়ার্স জুড়েই যেন চলছে মহীরুহ নিধন যজ্ঞ। স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতিতে প্রাচীন অতি মূল্যবান গাছগুলি কাটা হল রাস্তা চওড়া হবে এই যুক্তিতে। প্রতিবাদ করেও স্থানীয় বাসিন্দারা তা থামাতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুযায়ী একটি গাছ কাটলে ছ'টি গাছ লাগাতে হবে— কিন্তু প্রশাসনই যেখানে সেই আদেশের তোয়াক্কা করে না, আম আদমি কোন ছার! রাস্তা চওড়া করতে গাছ নিধন যদি বা মানা যায়, জঙ্গলের গাছ কেটে বসতি বা রিসর্ট তৈরির বিষয়টি মানতে হবে কোন যুক্তিতে?

অরণ্য নিধন করে মানুষের বসতি গড়ে ওঠায় হাতিদের চলার পথেও ঘটেছে বিঘ্ন। হাতি যে পথে যাতায়াত করে, এক কথায় হাতির চলাচল পথই হল 'এলিফ্যান্ট করিডর'। এই পথ হাতিরা তৈরি করে থাকে জঙ্গলের ভিতরে, কখনও জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার মধ্য দিয়ে। ওই পথ ধরে হাতির দল এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে যায় এবং ফিরেও আসে ওই নির্দিষ্ট পথ ধরে। মূলত এই যাতায়াত চলে খাদ্যের সন্ধানেই। একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির পেট ভরতি হতে প্রতিদিন দরকার পড়ে গড়ে প্রায় দেড়শো কেজি পরিমাণ খাদ্য। এই খাদ্যতালিকায় রয়েছে বুনো বাঁশের মূল, কচি বেত, কলা গাছ, কলা গাছের ভিতরকার সাদা অংশ, শাল গাছের গোড়ায় গজানো গুল্ম, কয়েকটি গাছের পাতা, ছাল ও লম্বা ঘাস। হাতিও জানে, একটি নির্দিষ্ট জঙ্গল দিনের পর দিন ওই পরিমাণ খাদ্যের জোগান দিতে পারবে না। তার মানে তাকে অন্য জঙ্গলে যেতে হবে। সেই জঙ্গলের খাবার ফুরালে ফের আর-এক জঙ্গল। এইভাবেই 'এলিফ্যান্ট করিডর' ধরে চলে তার জীবননির্বাহের পরিক্রমা। কিন্তু হাতি ফিরে আসে ছেড়ে যাওয়া জঙ্গলে। কারণ, ততদিনে ছেড়ে যাওয়া জঙ্গল আবার খাদ্যসম্ভারে সেজে উঠেছে। এই পরিক্রমণ যেমন নির্দিষ্ট পথ ধরে, তেমনই সময়ের ব্যবধানও নির্দিষ্ট। আর এইসব কারণেই হাতি বাস করে দলবদ্ধভাবে।

ডুয়ার্স জঙ্গলেও হাতির জীবননির্বাহ চলে এই নিয়মে। বহুকাল ধরে তোর্সার পুব ও পশ্চিমে বাস করছে তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে। সেইসব দলে যোগ দিতে ভুটান ও আসাম থেকেও হাতির দলও আসে জঙ্গলের ভিতরকার হাতিপথ ধরেই। ভুটান ও আসাম থেকে হাতিদের সঙ্গে ডুয়ার্সের হাতির দলের মিলনস্থল হল চাপড়ামারি। এখানে আসা ও ফিরে যাওয়ার জন্যও আছে পথ। এইসব পথেই রয়েছে গোরুমারা, আপালচাঁদ, কাঠামবাড়ি প্রভৃতি জঙ্গল। সেইসব পথ দিয়ে দল বেঁধে তারা যেমন আসে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ফিরেও যায় আবার। কিন্তু হাতি তার চেনাজানা পথ এখন প্রায়ই গুলিয়ে ফেলছে। কারণ তার নির্দিষ্ট চলার পথে গজিয়ে উঠেছে বসতি, অসংখ্য জনপদ। সে হঠাৎ করে আলাদা পথ তৈরি করে ফেলতে পারছে না। যদিও বনভূমির মধ্যে, নদীর চরে পিলপিল করে বেড়ে ওঠা জনপদ সম্পূর্ণত বেআইনি। কিন্তু প্রশাসন প্রাথমিক অবস্থা থেকেই সেগুলি জেনে-বুঝেই এড়িয়ে গিয়েছিল। অথচ হাতি তার চলার অভ্যস্ত পথে এসে পড়লেই বলা হচ্ছে, লোকালয়ে হাতির হানা। হাতির বাসভূমিতে ঢুকে পড়া মানে তো অনুপ্রবেশ। কিন্তু সেই অনুপ্রবেশই আজ স্বীকৃত। তাই হাতি তার অভ্যস্ত এবং বৈধ পথ ধরে চললেই আমাদের বলতে হবে, হানা কিংবা আক্রমণ। আর সেই হানা রুখতেই বন দপ্তর, এমনকি রাজ্য সরকারও তৎপর হয়ে ওঠে। তার মানে কি নিজের বাসভূমেই প্রাচীন বাসিন্দাদের দিন ফুরিয়ে এল?

মিতা বসু, আদর্শপল্লি, বানারহাট

ঘুসি খেয়ে পিছটান দিল লেপার্ড

ধেড়ে খোকাদের পান্ডা নয়, এক ঘুসিতে ঠান্ডা ডোরাকাটা লেপার্ড না, কোনও পালোয়ানের গল্পকথা নয়। আপাদমস্তক এমন এক সত্যি ঘটনা ঘটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। আর তারপর থেকেই লিসরিভার চা-বাগান লাগোয়া ছাউগাঁও বস্তির সংগীতা বনে গিয়েছে হান্টারওয়ালি। সংগীতার বারো সিক্কার থাপ্পড়ে ডোজের মাত্রা যে কী পরিমাণ উচ্চতা পেয়েছিল, সে একমাত্র লেজ গুটিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যাওয়া লেপার্ডই জানে। অনেকটা যেন ছিল বাঘ, হয়ে গেল বিড়াল।

ডুয়ার্সের মাল মহকুমার লিসরিভার চা-বাগান বস্তির গায়েই জঙ্গল। দুপুরবেলা বাগানের হোপ ডিভিশনের এক নম্বর সেকশন থেকে পাতা তুলে ওজনের জন্য অফিসের দিকে যাচ্ছিল সংগীতা। হঠাৎ জঙ্গল টপকে ঢুকে পড়ে এক লেপার্ড। একেবারে বাঘে-মানুষে মুখোমুখি। এর পরের ঘটনা আন্দাজ করা তো খুবই সহজ। নাগালে পেয়ে দাঁত-নখ উচিয়ে সংগীতার উপর ঝাঁপ মারবে বলে তৈরি সে। আচমকা লেপার্ড সামনাসামনি এসে পড়ায় সংগীতা কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ঘাবড়েঘুবড়ে একাকার হয়ে পড়েনি। লেপার্ডের চোখে চোখ রেখে মনে মনে একটা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল। দূর থেকে দু'-একজন চা-বাগানকর্মী সেই দৃশ্য দেখে তো একেবারে হতভম্ব। তারা কী করে ভেবে ফেলার আগেই দেখল লেপার্ড ঝাঁপ দিয়েছে সংগীতার উপর। কী ভয়ংকর দৃশ্য! ভাবলেই গায়ে কাঁটা জেগে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত যমে-মানুষে টানাটানির মতোই সংগীতা আর লেপার্ডের লড়াই চলতে থাকে। এর পর সংগীতার মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতের একটি সজোরে 'পাঞ্চ' গিয়ে পড়ে লেপার্ডের চোয়ালে। মুহূর্তে চিতা পিছনে ফেরে। বোঝাই যাচ্ছে, ওই ঘুসি

সে তক্ষুনি মোটেও হজম করতে পারেনি। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে লড়াইয়ের রিং ছেড়ে একেবারে পিছটান দেয় সেই লেপার্ড। যারা দূর থেকে ওই দৃশ্য দেখে বাস্তব জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল, তারা আকস্মিকতা কাটিয়ে ছুটে আসে। রক্তাক্ত সংগীতাকে কোলে তুলে নিয়ে যায় বাগানের হাসপাতালে। সেখান থেকে মাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সংগীতার রক্ত-ঝরা হাত-পায়ের চিকিৎসা হয়। সে দিন সন্ধের মধ্যেই অবশ্য সংগীতা ঘরে ফিরে আসে। এখন সে দিব্যি আছে। বাগানে চায়ের পাতা তোলার কাজে ফের যোগ দিয়েছে। কিন্তু লেপার্ডটি সেই আকস্মিকতা কাটিয়ে কেমন আছে, সংগীতার ঘুসি খাওয়ার পর তার চোয়াল আগের মতোই শক্তপোক্ত, মজবুত আছে কি না জানা যায়নি। কীভাবেই বা জানা সম্ভব? বনকর্মীরা কি আর বিশাল ওই অরণ্যের বন্য প্রাণীদের খোঁজখবর যথাযথ রাখতে পারেন? তবে এই ঘটনার পর মাল স্কোয়াডের বনকর্মীদের বিরুদ্ধে ছাউগাঁও বস্তিবাসীদের ক্ষোভ বেড়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, চা-বাগান মানুষের হলেও তা কিন্তু লেপার্ড বাঘেরও পছন্দের জায়গা। পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখতে হবে, প্রসব করার কিছুদিন আগে থেকেই লেপার্ড কিন্তু লোকালয়ের ঝোপঝাড়ে থাকতে পছন্দ করে। যদিও এ ক্ষেত্রে জানা যায়নি ওই লেপার্ড সেরকম অবস্থাতেই আছে কি না। কিন্তু গরম পড়তে শুরু করলে লেপার্ড জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। এর আগেও ঢুকেছে।

রাবেয়া সুলতানা, বহরমপুর

লোকালয়ে লেপার্ড ডুয়ার্সে অস্বাভাবিক নয়, অভাব নজরদারির

ভোটের বাজারেও খবরের শিরোনামে উঠে আসছেন তাঁরা, যাঁদের নেই প্রার্থী হওয়ার অধিকার, এমনকি ভোটাধিকারও। যদিও তাঁরা ডুয়ার্স বনাঞ্চলের আদি বাসিন্দা। এ বছরের শুরু থেকেই চিতা বাঘ কিংবা হাতি, হানাদার হিসেবে চমকপ্রদ খবর ডুয়ার্স এলাকায়। ২১ জানুয়ারি কোচবিহারের শীতলখুচিতে চিতা বাঘের তাণ্ডব, জখম পাঁচ, আট ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে জালবন্দি। ২৬ জানুয়ারি দাঁতালের তাণ্ডব ডুয়ার্সের বড়দিঘি এলাকায়। ১১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া এলাকা দাপায় হাতি। ১৩ ফেব্রুয়ারি ফের আমবাড়ি এলাকায় এক ব্যক্তিকে আছড়ে মারে মাকনা। আবার হাতির হানা এবং একজনের মৃত্যু মাদারিহাটের খয়েরবাড়ি এলাকায়। এখনও পর্যন্ত শেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ধূপগুড়িতে মগডালে উঠে বসেছিল লেপার্ড। যদিও এ কথা আজ প্রায় প্রত্যেকেই স্বীকার করছেন যে, হাতি-লেপার্ড-বাইসন বা বন্য প্রাণীরা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে না কিংবা হানাও দিচ্ছে না। মানুষই দখল করেছে বন্য প্রাণীদের বাসভূমি। কিন্তু তবু আমরা সবাই সর্বত্রই বলে চলেছি হাতির হানা, লেপার্ডের হানা লোকালয়ে। ২ মার্চের ঘটনাটিও সেই একই আঙ্গিকে দেখা। ভোর হতে না হতেই নাকি একটি লেপার্ডের দর্শন মিলল কদম গাছের ১৫ ফুট উঁচু ডালে। এর পর তাকে দেখা গেল ৪০ মিটার দূরের একটি মেহগনি গাছের ৪০ ফুট উঁচু ডালে। খবর পেয়ে একে একে বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াড, মালবাজারের বনকর্মীরা, পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি থেকে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়ার বিশেষজ্ঞরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। বন্য প্রাণ বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে বন্য প্রাণী বিভাগের ডিএফও, প্রত্যেকেই হাজির হয়ে যান ধূপগুড়ি ১৬ নং ওয়ার্ডে। ক্রমশ লেপার্ড দর্শনে এত মানুষ জড়ো হয়ে পড়েন যে, ঘুমপাড়ানি গুলি

ছোড়ার সাহস পাননি বনকর্মীরা। সবরকম শাসানি-ধমকানি উপেক্ষা করে ওই ভিড়ের মধ্যের কিছু মানুষ আবার মোবাইলে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পারলে গাছে উঠে লেপার্ডের সঙ্গে নিজস্বীও তুলে ফেলতে পারতেন। অবস্থা সেই পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে অবশ্য ফালাকাটার সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানদের ডাকতে হয়। তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাঠি চালিয়ে ভিড় হালকা করার পর লেপার্ডকে কাবু করতে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হয়। লোহার খাঁচার ভিতর থেকে গুলি ছোড়ে চার বনকর্মী। গুলি খেয়ে লেপার্ড ডাল বেয়ে নামতে থাকে অবশ শরীরে। যাতে সে মাটিতে পড়ে আঘাত না পায়, তার জন্য আগে থেকেই জাল বিছানো হয়। কিন্তু লেপার্ডটির অবশ শরীর যেখানে পড়ে, সেখানে জাল ছিল না। যা-ই হোক, লেপার্ডটিকে সুস্থ-সবল করেই বনে ছাড়া হয়েছে, এমনটাই আশা করা যায়।

পরপর এ ধরনের ঘটনায় উদ্‌বেগ ছড়াচ্ছে লোকালয়ে। বন দপ্তর থেকে প্রশাসনের চিন্তা বাড়ছে। সকলেই জানেন যে, খাবারে টান পড়েছে। ওদের আস্তানা কখনও পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, কখনও গোপন ডেরা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে লাঠিসোঁটা, বল্লম, বন্দুক নিয়ে হামলা করে। মহা জাঁতাকলে পড়েছে ওরা। তাই কখনও মগডালে আশ্রয় নিচ্ছে, কখনও লাফাতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে যাচ্ছে, কখনও সামনে পাওয়া বনকর্মী, বনবস্তির লোকেদের আঁচড়ে-কামড়ে রক্ত ঝরিয়ে নিজেও রক্তাক্ত হচ্ছে। লোকালয়ে ঢুকে পড়া বা মানুষের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে এ পর্যন্ত বহু পরিকল্পনা হয়েছে। প্রতিটি ঘটনার পর রূপরেখাও তৈরি হয়, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় না।

বন দপ্তর সূত্রে জানা যায়, ইতিমধ্যে পরিবেশবিদদের কাছ থেকে পাওয়া অনেক প্রস্তাবও ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে। তার থেকেও বড় কথা, বনাঞ্চলের আদি বাসিন্দারা সংখ্যায় এখন ঠিক কত, কোন কোন এলাকা তার বিচরণভূমি— এসব বিষয়ে কোনও স্পষ্ট তথ্য নেই। জানা নেই, একটি প্রাপ্তবয়স্ক চিতা দিনে যে ৬-৭ কেজি মাংস খায়, তার জন্য চিতার খাদ্যতালিকায় থাকা হরিণ, বন্য শুয়োর আছে কত। নিশ্চয় সংখ্যাটা অত্যন্ত কম। তা না হলে চা-বাগানের ঝোপে, নালায়, কালভার্টের নিচে ডেরা করে হাঁস, মুরগি, শুয়োর, ছাগল, বাছুর শিকারের প্রবণতা বাড়ছে কেন?

চোরাগোপ্তা শিকার চলছে— এ কথা যেমন ঠিক, তেমনই মনে রাখা দরকার, ডুয়ার্স বনাঞ্চল থেকে লেপার্ড, বাইসন, হাতি লোকালয়ে আগেও ঢুকত, ভবিষ্যতেও ঢুকবে। অন্য বনাঞ্চলের মতো ডুয়ার্সেও সুখা মরশুম চলে। ফেব্রুয়ারির গোড়া থেকে বৃষ্টির অভাবে বন শুকনো খটখটে হয়ে যায়। এই সময় বনে দাবানলও হয়। অন্য দিকে, গবাদি পশু চরাতে বনে ঢোকা বনবস্তির লোকও আগাছা জ্বালিয়ে দেয়। তাতে সবুজ ঘাস জন্মায়। মার্চে বৃষ্টি হলে তড়তড়িয়ে বাড়ে ঘাস। তখন গবাদি পশুর খাবারের সংস্থান হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বনকর্মীদের নজরদারি কতটা কড়া? বন দপ্তর বলে আসছে, অন্তত পক্ষে ২০ হাজার কর্মীর অভাব।

সচেতনতার প্রচারও ব্যাপক নয়। অন্য দিকে, হাতির লেজের লোম দিয়ে মাদুলি বানানো, লেপার্ডের দাঁত, শুকনো জিব নিয়ে নানা কুসংস্কার, অপপ্রচার চলে চূড়ান্ত পর্যায়ে। যার ফায়দা তুলছে চোরাশিকারি চক্রের পান্ডারা। ঘটনা হল, বাম থেকে ডান— সব আমলেই বন আর বন্য প্রাণীর জন্য কয়েকশত প্রস্তাব সংবলিত ফাইল তৈরি হয়েছে। প্রকল্প ঘোষণাও হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশেই ধুলো জমেছে। গন্ডারের জন্য নতুন বাসভূমি তৈরির কাজ মাঝপথে থেমে গিয়েছে। গাজলডোবা মেগা টুরিজম হাবে শতাধিক কোটি টাকার পরিকাঠামো প্রশ্নচিহ্নের আকার ধারণ করেছে। বিধানসভা ভোটের আগেই ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সাফারি পার্ক চালু হয়ে গিয়েছে। অথচ ডুয়ার্সের বন আর বন্য প্রাণী আজ ধ্বংসের মুখে।

পারমিতা চন্দ, চন্দননগর, হুগলি

এক ঈশ্বরের গল্প

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

আয়নার টুকরো কাচে তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মুখটি মাঝে মাঝেই ভেসে ওঠে। কত খণ্ড খণ্ড ছবি। একা একা জোড়া লাগাই, আর এক অখণ্ড অবয়ব ভেসে ওঠে। সেই কতকাল আগে তাঁর পা ছুঁয়ে বুঝেছিলাম প্রণামের প্রকৃত অর্থ। অথচ তিনি প্রণাম নিতে চাইতেন না। ছোট-বড় সবাইকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। আইকন শব্দটির এখন খুব চল! অকারণ ব্যবহারের বাড়াবাড়ি! অথচ তিনি ছিলেন প্রকৃত আইকন। নিরুচ্চার, অথচ তাঁর প্রতিদিনের জীবনযাপন আমাদের নতুন করে শেখাত।

জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র বি.এড. ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ। নামে ডাকসাইটে, কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। এত সাধারণ, এতটাই সাধারণ। রুগ্ণ চেহারা, শ্যামবর্ণ। খটখটে, সেই সঙ্গে কোথাও অসাধারণত্বের তিলমাত্র ছাপ নেই। কথাবার্তায়? না, সেখানেও অতীব সাধারণ। কখনও সোচ্চার নন, খুব গুছিয়ে কথাও বলতে পারেন না। তখন জলপাইগুড়ি বি.এড. কলেজের নামডাক সারা রাজ্যব্যাপী। আর তার পিছনে তিনি, শুধু তিনি। অথচ ক্যাম্পাসে ঢুকে তাঁকে চেনার জো-টি নেই! সেই লোকটির গপ্প মনে পড়ে। তিনি কলেজে ঢুকলেন মেয়ের ভরতির ব্যাপারে খোঁজ করতে। অনেক দূর থেকে একটু আগেই চলে এসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই কলেজ ক্যাম্পাস তখন শুনশান। প্রাঙ্গণে থরে থরে ফুলের গাছ। কত রঙের ফুল ফুটে আছে। আর ধুলোবালি মেখে এক মালি আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে। কী নিপুণ যত্নে আগাছা পরিষ্কার করছে। তিনি এগিয়ে গেলেন
মালির কাছে।

—আচ্ছা, কলেজ কখন খুলবে বলতে পারো?

—সওয়া দশটা নাগাদ অফিস খুলে যাবে। ছোট্ট উত্তর।

—সুশীল রায় কলেজে আছেন, মানে প্রিন্সিপাল?

—আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন?

—হ্যাঁ, কখন যে ভদ্রলোক আসেন! ওঁর সঙ্গে কথা বলা জরুরি ছিল। অনেক দূর থেকে এসেছি।

—উনি আছেন। আপনি চাইলে কথা বলতে পারেন।

—কোথায়? কোয়ার্টারে? ঘরে গিয়ে কথা বলা কি ঠিক হবে?

—না, এখানেই কথা বলতে পারেন।

—মানে? বুঝলাম না!

—আমাকে বলতে পারেন।

এই ছিলেন তিনি! একজন গগনচুম্বী মানুষ। অথচ সামনে চেনাই যেত না। খটখটে চেহারার মানুষটি থরে থরে ফুল ফোটাতেন। তাঁর ছোট্ট নাতনিটিও শিখে গিয়েছিল, ফুল ছেঁড়া অন্যায়।

তারপর তাঁর ক্লাস করা শুরু হল। ভারতের অন্যতম সেরা শিক্ষক। শিক্ষাবিজ্ঞানে তাঁর লেখা বই প্রায় সব কলেজ-বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। অথচ প্রথম দিন শ্রেণিকক্ষে মনে হল, এত সাধারণ! রোল কল শেষে তাঁর দু'টি চোখ চলে যেত দেয়ালের দিকে।

পনেরো মিনিট ইংরেজিতে, পনেরো মিনিট বাংলায়— এইভাবে তাঁর প্রেজেন্টেশন। কারও দিকে তাকাচ্ছেন না। যা ইংরেজিতে বলছেন, হুবহু তার বাংলা তরজমা বলছেন তারপরেই।

ক'দিন পরেই এক বিচ্ছু ছাত্র তাঁর তাকানো দেয়ালের ক্যানভাসে বড় বড় করে লিখে রাখল— 'হে দেয়াল, তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?' পরদিন তিনি ক্লাসে এলেন। রোল কল সেরে চোখটা বুঝি একটু ধাক্কা খেল! কিন্তু মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। শুধু চোখটা একটু সরে গেল। দেয়ালের জন্য এক ফাঁকা অংশ খুঁজে নিল তাঁর চোখ দু'খানা।

অদ্ভুত, কারও দিকে ভাল করে তাকাতেন না, কিন্তু ক্লাস শুরুর এক সপ্তাহ পর থেকেই সব্বাইকে নামে নামে চিনতেন। কোনও প্রয়োজন হলে নাম ধরে 'আপনি' সম্বোধনে কথা বলতেন। কোনও দিন জিজ্ঞেস করতেন না, 'আপনার নামটা কী যেন?' কীভাবে কখন এই অনুশীলন তিনি করতেন কে জানে!

ডেপুটেশনে যে টিচাররা ভরতি হতেন, তাঁদের অর্ধেক বেতন সরকার থেকে কলেজে আসত, অর্ধেক স্কুল থেকে। নিয়মিত কয়েক মাস বি.এড. কলেজ থেকে বেতন পাবার পর ডি.আই. অফিস থেকে তাঁদের কেউ কেউ জানতে পারলেন, বেতনের অ্যালটমেন্ট তখনও আসেনি। অথচ বেতন বন্ধ নেই এতজন শিক্ষক-শিক্ষিকার। তারা দল বেঁধে গেল স্যারের কাছে।

তিনি বললেন, 'এত কথার কী আছে? আপনারা অনেকেই সংসারী মানুষ। টাকা না পেলে অসুবিধা হবে। তাই...'

তিনি বলেননি, এ নিয়ে বেশি কিছু কথা শুনতেও চাননি। অনেক খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কলেজ ফান্ড নয়, নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে মাসের পর মাস শিক্ষকদের বেতন দিয়ে গিয়েছেন মানুষটি। ধন্যবাদ জানাতে গেলে ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন।

কলেজ পরিষ্কার করতে হত ছাত্রছাত্রীদের। দেখা যেত, তিনিও তখন কাজ করছেন। ল্যাট্রিন, ইউরিনাল পরিষ্কারে সবার আগে তিনি হাত লাগিয়েছেন। একদিন পায়খানার ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতেও তাঁকে দেখা গেল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, লোকটি কোনও কথা বলছেন না, নির্দেশ দিচ্ছেন না, অথচ আমরাও কাজ করছি!

পড়াশোনা কীভাবে আদায় করে নিতে হয়, সেটাও জানতেন। যতই রাগ হোক, পড়তে হবেই! ফাঁকি নেই। জলপাইগুড়ি তাঁকে কতটা মনে রেখেছে কে জানে। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার নিজেই সম্মানিত হত, যদি তাঁর হাতে সেরা শিক্ষকের সম্মান তুলে দেওয়া যেত। যত দূর জানি, শিক্ষক দিবসে দিল্লি বা কলকাতায় সুশীল রায় ডাক পাননি।

অবসরের পর নীরবে জলপাইগুড়ি থেকে কোন সন্ন্যাসে কোথায় চলে গেলেন। হয়ত বুক জুড়ে অভিমান ছিল। কিংবা তিনি সব মান-অভিমানের ঊর্ধ্বে। ঈশ্বররা তা-ই হন তো!

পথিক বর

ডেপুটেশনে যে টিচাররা ভরতি হতেন, তাঁদের অর্ধেক বেতন সরকার থেকে কলেজে আসত, অর্ধেক স্কুল থেকে। নিয়মিত কয়েক মাস বি.এড. কলেজ থেকে বেতন পাবার পর ডি.আই. অফিস থেকে তাঁদের কেউ কেউ জানতে পারলেন, বেতনের অ্যালটমেন্ট তখনও আসেনি। অথচ বেতন বন্ধ নেই এতজন শিক্ষক-শিক্ষিকার।

হোলিতে এবার খুশির রং নেই চা-বাগানে

কাগজ-কলমেই রয়ে গেল ‘সহায় কর্মসূচি’

মাইলের পর মাইল সবুজ চা-বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটে যায় কালো মসৃণ পিচ রাস্তা। কোথাও বাগান সমতল, কোথাও বা উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো। আবার কোথাও দূর থেকে হাতছানি দেয় পাহাড়। হঠাৎই কোনও ঝোরা বা নদী দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। ছমছমে বন-বনানী আবার অন্য অনুভূতি উসকে দেয়। ডুয়ার্সের বিপুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের আড়ালে পড়ে থাকে হাড়-হাভাতে গ্রাম, বনবস্তি। বিশেষ করে চা-বাগানের শ্রমিক বসতিগুলি। না, আমরা তা দেখতে পাই না। দেখতে চাইও না।

বাগানে যদি হাজার মানুষ কাজ করেন, স্থায়ী কিংবা ঠিকা— তবে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ সে বাগানে নানা বসতিতে, বাগান লাগোয়া গ্রামগুলিতে বসবাস করেন। বাগান যখন রুগ্‌ণ বা বন্ধ কিংবা ডানকানের মতো অঘোষিতভাবে বন্ধ— তখন হাহাকার পড়ে যায় গ্রামে গ্রামে।

রাজ্যের অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে এই গ্রামগুলিকে মিলিয়ে ফেললে ভুল হবে। বাগান-গ্রাম প্রায় সম্পূর্ণ বাগাননির্ভর। বাগানে শ্রমিকরা কাজ করেন। শ্রমিক পরিবার রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে ছোটখাটো দোকানদার থেকে হাজার পেশার মানুষ। যখন হাট বসে, তার চেহারা-চরিত্রও বাগানকেন্দ্রিক।

এই গ্রামের মানুষের জমি নেই যে ধান-গম-আলু-সরষে-শাক-সবজি চাষ করবে, ফসল ফলাবে। বাগানের রেশনের চাল-গমের উপর নির্ভরশীল বাগান শ্রমিকরা যদি বাগান চালু থাকে, রুগ্‌ণ না হয়ে পড়ে। যদি মালিক বাগানের প্রতি, শ্রমিকের প্রতি যত্নবান হন। বাগান শ্রমিকদের আবাসন-পানীয়, জল-বিদ্যুৎ আরও অনেক দায়িত্ব মালিকের। শিশুদের জন্য ক্রেশ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাও— এটাই আইন। ‘কেন্দ্রীয় প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট’ তো তা-ই বলছে। আর কতটুকু মেলে? ভুক্তভোগী মানুষই তা জানে।

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের একটি চা-বাগান ভাতখাওয়া টি এস্টেট। এই বাগানের শ্রমিক মোহন ভক্তা। ১৬ বছর তিনি বাগানে কাজ করছেন। আজও তাঁর আবাসন নেই। বাঁশ, কাঠ, ত্রিপল, টালি দিয়ে ঘর সাজিয়েছেন। অথচ কথা ছিল, কাজে যোগ দেওয়ার ছ'মাসের মধ্যে ঘর পাবেন। এমনই পরিস্থিতি ওই বাগানের ৭১ জন শ্রমিকের। সংখ্যাটা আরও বেশিও হতে পারে। এই সংখ্যা

জানা গেল, তার কারণ, ওই ৭১ জন লিখিত আবেদন নিয়ে ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিলেন নতুন আবাসনের জন্য। ম্যানেজার আবেদন গ্রহণই করেননি। এমনটাই জানিয়েছেন বাগান শ্রমিকদের অন্যতম আবেদনকারী কমল ওঁরাও।

এ তো গেল মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের কথা। কিন্তু এই বাগিচা গ্রামগুলো, যেখানে শ্রমিকরা তাঁদের পরিবার নিয়ে থাকেন, অন্যান্যরাও রয়েছেন, সে তো পঞ্চায়েতের অধীন। এই যে বর্তমানের গীতাঞ্জলি বা পূর্ব সরকারের ‘আমার বাড়ি’ প্রকল্প, তার প্রয়োগ সেখানে দেখা যায় না কেন? কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নানা উন্নয়নমূলক বা সহায়তা প্রকল্পগুলি রয়েছে তা রাজ্যের অন্য গ্রামগুলির তুলনায় এত অপ্রতুল কেন?

গীতাঞ্জলি (সরকারি বানান অবশ্য গীতাঞ্জলী) প্রকল্পে কারা বাড়ি পেতে পারেন— না গ্রাম বা আধা শহরে (মিউনিসিপ্যালিটি নয়) গরিব, দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ, যাঁদের পরিবারের মাসিক আয় ৬০০০ টাকার বেশি নয়। ধরা যাক, ভাতখাওয়া— ওই যে বাগানের শ্রমিকরা দৈনিক ১২০ টাকা মজুরি পান। মাসে দাঁড়াল ৩৬০০ টাকা। তবে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পে তাঁরা বাড়ি একটা পেতেই পারেন। ইন্দিরা আবাস যোজনায় কোথাও কোথাও শ্রমিকরা বাড়ি পেয়েছেন। তবে প্রকল্পটি একটু ভিন্ন ধরনের।

নাগরাকাটার নয়াশৈলী চা-বাগানের লাইনকাটা গ্রামে অন্তত ৫০০ জন থাকেন। তাঁদের একজন বেশিঁ ওঁরাও। সাত বছর আগে তাঁর স্বামী মারা গিয়েছেন, অথচ বিধবা ভাতার জন্য আবেদন করেও কিছু মেলেনি। ওই বিধবা দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী এক মহিলা এবং একজন আদিবাসী। রাষ্ট্রের, সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জাবদা নথিগুলো খুলে দেখুন— এই জাতীয় একজন মহিলার জন্য কী অথই দরদ। আর ডুয়ার্সের চা-বাগানের অধিকাংশই তো আদিবাসী। বাগানে বাগানে যখন হাহাকার, তখন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর বা মন্ত্রকের কোনও নড়াচড়ার আওয়াজ শোনা যায় না। মাসিক ৬০০ টাকা করে ভাতা পেতে পারতেন বেশিঁ ওঁরাও। একটু তো সুবিধা হত। ওই ৬০০ টাকাটা যে কত জরুরি, তা চারবেলা পেট ভরে খাওয়া মানুষদের বোঝানো যাবে না। বেশিঁর যা রোজগার তা সংসারের আধা পেট ভরতেই চলে যায়। প্রশ্ন করা হয়েছিল, টাকা পেলে কী করবেন? বলেছিলেন, ‘ছেলেমেয়েদের জন্য খরচা করতে পারি।’

এই বিধবা মানুষটি আরও একটি সহায়তা থেকে বঞ্চিত। সেটি হল ‘জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প’। দরিদ্র পরিবারের মূল উপার্জনকারী অকালে মারা গেলে তাঁর বিধবা স্ত্রী প্রথমে এককালীন ৪০০০০ টাকা পেতে পারেন। মূল উপার্জনকারী মৃত্যুর দু'মাসের মধ্যে আবেদন করলে, নথিপত্র পরীক্ষার পর দু'সপ্তাহের মধ্যে ওই টাকা পাওয়ার কথা। বাগান বন্ধ হলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যথাযথভাবেই আন্দোলনে নামে মালিক বা সরকারকে শাপশাপান্ত করে। মজুরি বৃদ্ধির লড়াইও জারি থাকে। কখনও কখনও তা জোরদারও হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পঞ্চায়েতব্যবস্থাটা যে আজও চা-বাগানে যথাযথভাবে কার্যকর হয়ে উঠল না, তা নিয়ে আলোচনা খুব একটা শোনা যায় না।

না খেতে পেয়ে মারা গেলেন কত মানুষ। রোগে ভুগে, চিকিৎসার অভাবে মারা গেলেন। অথচ এ কথা তো বলা যাবে না, রাজ্যে মন্বন্তর হয়েছিল। খাদ্যের অভাব ছিল। ‘এক সহায় প্রক্রিয়া বা কর্মসূচি’ চালু করতে পারলে এই মর্মান্তিক দৃশ্য আমাদের দেখতে হত না। কী কী সহায়তা পেতে পারতেন এই মানুষরা? আজও পেতে পারেন?

যেমন— ক) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, খ) জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, গ) ১০০ দিনের কাজের সুবিধাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো, ঘ) গণবণ্টনের সঠিক বিতরণের ক্ষেত্রে বেশি তদারকি। এই জাতীয় চালু পরিষেবাগুলির সঙ্গে ‘সহায় কর্মসূচি’ অর্থাৎ ‘রান্না করা’ খাবার দিয়ে সহায়তা। পাশাপাশি যুক্ত করে ফেলা যায় অন্য পরিষেবাগুলিও। যেমন— ১) পরিবারের শিশুদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো, ২) অসুস্থ ব্যক্তিদের সরকারি স্বাস্থ্য

পরিষেবাগুলির সঙ্গে যুক্ত করা, ৩) পরনের পোশাক ও শীতকালে শীতের পোশাক দেওয়া।

কীভাবে এই কাজটি করা হবে? পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের সমন্বয় ঘটিয়ে।

পাঠক, সরকারি কর্মসূচিটি হুবহু তুলে দিলাম পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রকাশিত ম্যানুয়াল থেকে। কাজটি হল না। বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ রইল মাত্র।

চা-বাগানের রুজির সমস্যা, মালিকের ভ্রষ্টাচারের সমস্যা, সরকারের অকর্মণ্যতার সমস্যা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিক্রি হয়ে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে। পাশাপাশি চা-বাগানের, বাগিচা গ্রামের বাসিন্দাদের পঞ্চায়েতি রাজের সুযোগগুলি না-পাওয়া তো আরও এক প্রবল বঞ্চনা। সে বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইটাও যে জরুরি। আর কবে তা বুঝব?

দেবাশিস আইচ

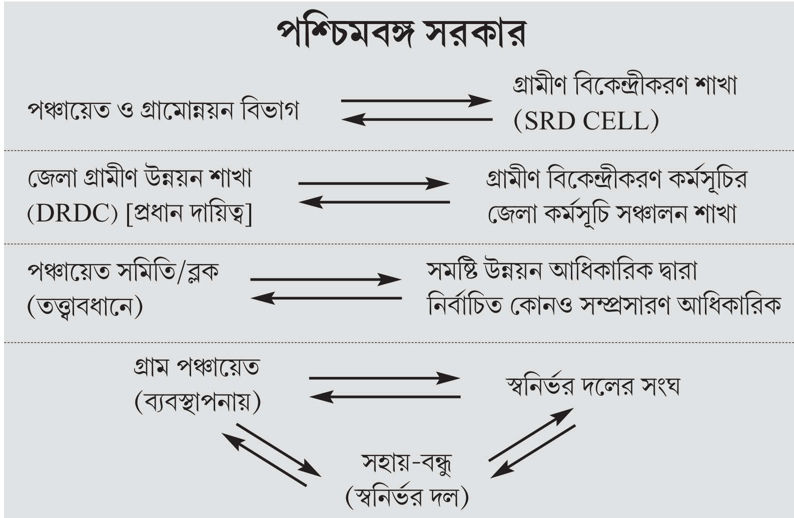

সৌজন্য- ভিডিয়ো ভলান্টিয়ারস পশ্চিমবঙ্গ videovolunteers.org

অধিগ্রহণ কিংবা রেশন আসলে বন্ধ চা বাগান নিয়ে ভোটের রাজনীতি

নেই বন্ধ চা-বাগানের জন্য কোনও প্যাকেজ কিংবা চা শিল্পমহলের পক্ষে কোনও স্বস্তিদায়ক খবর— দেশের সাধারণ বাজেট প্রস্তাব কোনও পক্ষকেই যে খুশি করেনি তা জলের মতোই পরিষ্কার। অন্য দিকে ভোটের বাদ্যি বেজে ওঠায় বন্ধ চা-বাগানের মানুষ বুঝেই গিয়েছেন, তাঁরা যে অন্ধকারে ছিলেন, সেখানে আর কোনও ফাঁক দিয়েই এক চিলতে আলো এসে পড়বে না। বন্ধ চা-বাগানের বহু দুর্দশার ছবি ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি। শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলির আকচাআকচিও প্রত্যক্ষ করেছি। তারপরও এমন অনেক বন্ধ চা-বাগান রয়ে গিয়েছে, যারা এখনও আলাপ-আলোচনা থেকে একটু দূরেই পড়ে আছে।

কী অবস্থায় রয়েছে মহুয়া চা-বাগান? বন্ধ চা-বাগানের মৃত্যুমিছিল, অনাহার, অপুষ্টি নিয়ে কথার যুদ্ধ, রেশনের চাল-আটার মান-পরিমাণ নিয়ে অভিযোগ— এত কিছুর ভিড়ে মনে হয় ঠিকানাই হারিয়ে গিয়েছে মহুয়া চা-বাগানের। সে বাগানের আকাশে এখন উড়ে বেড়াচ্ছে শকুনের দল। যে চা-বাগান আজ থেকে ৩৭ বছর আগে ছিল একটি সাধারণ বস্তি। রাজ্য সরকারের দেখানো স্বপ্নে বিভোর হয়ে বস্তিবাসীরা নিজেদের ঘরদোর, জায়গাজমি তুলে দিয়েছিল বংশানুক্রমিক চাকরির আশ্বাসে। চা-বাগানটির ছিল না কোনও ফ্যাক্টরি। অর্থাৎ চা উৎপাদন নয়, শুধু কৃষিজাত চা ফলন। তাতেও চলছিল বেশ। বাগানের কাঁচা পাতা গাড়ি চেপে সরকারি খরচেই ১০০ কিলোমিটার দূরের হিলা চা-বাগানে পৌঁছাত। সেখানকার ফ্যাক্টরিতেই চা উৎপন্ন হত। একদিন আচমকা সেই মহুয়া চা-বাগানও বিক্রি হয়ে গেল। বাগানের নতুন মালিক কিন্তু এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে একেবারেই উৎসাহিত বোধ করলেন না। বাগান নিয়ে তাঁর কাজকারবার সে ব্যাপারে ইঙ্গিতও দিচ্ছিল। শোনা-বোঝা যাচ্ছিল, চা পর্যটন নামক নতুন কিছু গড়ে তোলার নিরীক্ষা চালাচ্ছে মালিক। সেই সোনার পাথরবাটিটি কী এবং কেন, বুঝে উঠতেই পারেনি বাগানের শ্রমিক কিংবা কর্মীরা। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়। অগত্যা শ'দুয়েক শ্রমিক আর তাদের উপর নির্ভরশীল সব মিলিয়ে সহস্রাধিক মানুষের পেটে পড়ে লাথি।

ডুয়ার্সের বন্ধ বা অচল চা-বাগান নিয়ে ইতিমধ্যে অনেকেই বহু বাক্য ব্যয় করে ফেলেছেন। সরকারি তরফের বহু বস্তা চাল-গম পৌঁছে গিয়েছে বাগানবস্তিতে। বহু নেতা-মন্ত্রীর গাড়ির চাকা এসে থেমেছে বন্ধ বাগানের গেটে। কিন্তু তাদের মধ্যে ৯৯ শতাংশই হয়ত জানেন না মহুয়া চা-বাগানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা। জানেন না বিগত কয়েক বছরে ঠিক কতজন চা শ্রমিক অনাহারে বা অপুষ্টিতে মরেছে, কতজন মহিলা শ্রমিক পেটের জ্বালায় কোন ধরনের পেশা বেছে নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, আরও দু'টি চা-বাগানের কথা এই আলোচনায় রাখাই যায়। কুমারগ্রাম এলাকার মধ্যে পড়ে রহিমাবাদ আর তুরতুরি চা-বাগান। বন্ধ বাগান আলোচনা বিধানসভা ভোটের উত্তাপে এখন বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। থিতিয়ে যেটুকু তলানি পড়ে আছে তা ডানকান ঘিরে। হয়ত সে কারণেই এ ধরনের বাগানগুলি কখনওই শিরোনামে উঠে আসেনি। ১০০ বছরেরও বেশি পুরনো রহিমাবাদ চা-বাগানটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি থেকে। এই প্রথম নয়, মালিক এর আগেও বহুবার এই বাগানটি বন্ধ করেছে। শ্রমিকদের বিভিন্ন পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে। বাগানটিতে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে শ্রমিকসংখ্যা সহস্রাধিক। বন্ধ হওয়ার আগেও বছর তিন শ্রমিকরা বাগানে কাজ করে শুধু বেতনটুকুই পেয়েছে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখেও মালিক কোনও দিন বাগানের উন্নতি করেনি।

বাগান ছেড়ে বহু শ্রমিক কাজের সন্ধানে চলে গিয়েছে অন্যত্র। যারা যেতে পারেনি, তারা এখন জীবন-মরণের মাঝামাঝি পড়ে আছে। নিজেরাও জানে না এভাবে আর কতদিন। কোনও দিনই বর্তমান মালিক চা-বাগানের নিয়মকানুনের পরোয়া করেনি। শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে কোনও ফলই পায়নি। একাধিক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে মালিকপক্ষের অনুপস্থিতিতে। তাহলে মালিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে কে?

রহিমাবাদ চা-বাগানের পাশেই তুরতুরি চা-বাগান। সেই বন্ধ চা-বাগানের কাহিনিও প্রায় এক। প্রায় একই রকম গল্প নিয়ে ডুয়ার্সে বহু চা-বাগানই বন্ধ পড়ে রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজ্য সরকার বন্ধ চা-বাগান কিংবা শ্রমিকদের সমস্যা মেটানোর যে পথ নিয়েছে তা সমাধানের স্থায়ী রাস্তা নয়। তা শুধুমাত্রই রাজনৈতিক সমাধান, যাতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যবাসীর কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখা যায়, যাতে বিরোধীদের আক্রমণকে খানিকটা হলেও প্রতিহত করা যায়। কেন্দ্রের বাগান অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে রাজ্যের রেশন নীতি তো সে কথাই বলে।

তপন মল্লিক চৌধুরী

উদয়ন জানতেন না রাজনীতিতে বাবার নামটাও একদিন ভুলতে হতে পারে !

গত কয়েক দশক ধরেই রাজ্যের প্রত্যন্ত জেলা কোচবিহার কিংবা তার সীমান্তবর্তী মহকুমা দিনহাটার পরিচয় হত প্রয়াত নেতা কমল গুহর নামে। অবশ্য দিনহাটাকে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিচিত করেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ এম এরশাদ সাহেব, যিনি ঘটনাচক্রে সেই কমল গুহরই বাল্যবন্ধু। অতি সম্প্রতি এরশাদ এসেছিলেন তাঁর শৈশবের ভূমি দিনহাটায়। এখানকার বিদ্যালয়েই তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি। সেই বিদ্যালয়ের কাঠের বেঞ্চে তাঁর পাশে বসতেন দুই বালক বন্ধু। একজন কমল, আরেকজন সুধীর। পরবর্তীকালে তিন ব্যক্তি তিন ধারার খ্যাতির বর্ণচ্ছটায় দীপ্তমান হয়েছেন। এরশাদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়কদের পঙ্‌ক্তিতে বসার অধিকারী হয়েছেন। কমল রাজ্যের রাজনীতির মানচিত্রে কোচবিহার জেলার দিনহাটার নামকে দিয়েছেন প্রতিষ্ঠা। সে সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক জনসাধারণের কাছে কমল গুহর ফরওয়ার্ড ব্লক বলেই পরিচিত ছিল। আরেক বাল্যবন্ধু সহপাঠী সুধীর অপর দুই বন্ধু যখন রাজনৈতিক যুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতার সিংহাসন অধিকার করার জন্য তাঁদের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়ে চলেছিলেন, তখন তিনি মানুষ গড়ার কারিগরের বৃত্তিকে বেছে নিলেন। প্রচারের আলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে গড়ে তুলেছেন অসংখ্য মানুষ। কমল ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন বছরকয়েক আগেই। একমাত্র জীবিত বন্ধুকে দেখতে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ছুটে এসেছিলেন দিনহাটায়। দুই বাল্যবন্ধুর পরিণত বয়সের এই আলিঙ্গনাবদ্ধ ছবি সংবাদমাধ্যমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। এখানে নেই কোনও কূটনৈতিক কৌশল বা প্রোটোকল। আছে পরিচয়ের সেই হৃদয়ের স্পন্দনের সেতুবন্ধন। এটাই তো প্রতিটি জীবের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম প্রাণীর দাবিদার। তাই সে খোঁজ করে তার শেকড়, তার জন্মস্থান, তার পারিবারিক পরিচয়। পিতৃ-মাতৃপরিচয়কে রক্ষা করতে সে জীবনকেও বাজি ধরতে পিছুপা হয় না। তাই বারবার এভাবে ছুটে আসে অতীতের ভূমিতে পরিচয়ের ইতিহাসকে ঝালিয়ে নিতে।

বেরুবাড়ি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তরের চুক্তির বিরুদ্ধে কমল গুহর নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক সমগ্র কোচবিহার জুড়ে যে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তার ফলে দেখা গেল, সে দিন রাজ্যের নির্বাচনে সারা রাজ্যে কংগ্রেসের অপ্রতিহত বিজয়রথের চাকা তার বিজয়কেতনকে রথের শীর্ষে উড়িয়ে নিয়ে চললেও, কোচবিহারে কমল গুহর প্রতিরোধে গতিরুদ্ধ হয়ে থমকে গেল। সারা জেলার একটি আসন ছাড়া বাকি সব ক'টি আসনই ছিনিয়ে নিয়েছে কমল গুহর নেতৃত্বের ফরওয়ার্ড ব্লক। পুকুরের শান্ত জলে ঢিল পড়লে যেমন জলের কম্পন এক বৃত্ত থেকে অপর বৃত্ত সৃষ্টি করে সারা পুকুরের জলে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি দিনহাটা কমল গুহর আন্দোলনের ঢেউ রাজ্যের অন্যত্রও সৃষ্টি করেছিল কম্পন। শিবাজি ছাড়া মহারাষ্ট্র, মহাত্মা গান্ধি ছাড়া গুজরাত (তখন অবশ্য গুজরাত-মহারাষ্ট্র এক ছিল), নেতাজি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ হয় না, তেমনি কমল গুহ ছাড়া দিনহাটা ভাবনায় জায়গা পায় না।

পিতা কমল গুহর রাজনৈতিক পরিচয়কে মূলধন করেই রাজনীতিতে নেমেছিলেন পুত্র উদয়ন গুহ। জীবিতকালেই নিজের আসনে বসালেও পুত্রকে জয়ী দেখে যেতে পারেননি কমলবাবু, কিন্তু নির্বাচনে নেমে উদয়ন, কমল গুহর প্রতি দিনহাটার মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকেই তাঁর দলের প্রতীক তথা নামের থেকেও অনেক বেশি মূল্যবান ও শক্তিশালী মূলধন বলে মনে করতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সে দিনের নির্বাচনী প্রচারপত্রে। এখনও শুধু এই কেন্দ্রেই নয়, সারা জেলার দেয়ালের চুনকাম তুলে নিলে দেখা যাবে, প্রয়াত কমল গুহর পরিচয়ের মূলধনকেই তিনি সবচেয়ে বড় হাতিয়ার করেছিলেন।

খবরে প্রকাশ, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের প্রার্থী রূপে এই দিনহাটা কেন্দ্রে মনোনয়ন পেয়েছেন। এটা তো এখন আর বলার প্রয়োজন নেই, তিনি কিছুদিন আগেই সিংহের সেই বলদীপ্ত প্রতীক ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে পদত্যাগ করে তৃণমূলের স্নিগ্ধ ঘাসফুলের প্রতীক বাগানের পদসঞ্চালনে অভ্যাস করতে তাদের সদস্যপদ নিয়েছেন। আমিষাশী সিংহ থেকে নিরামিষের উপকরণ ঘাসফুল শক্তিশালী কি না, সেটা আমিষ ও নিরামিষভোজীদের দ্বন্দ্বের বিষয়ই থাক। প্রশ্নটা উঠেছে অন্যখানে। উদয়নবাবু ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে পদত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিলেও তিনি তাঁর পিতার পরিচয়টাকে সামনে আনতে প্রয়াত কমল গুহর ছবি ছাপিয়ে প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। জানা গেল, তাঁর বর্তমান দল তৃণমূল থেকে নির্দেশ গেছে, কোনও প্রচারপত্রে তৃণমূলের সর্বাধিনায়িকার ছবি ছাড়া আর কারও ছবি ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ উদয়নবাবুকে, তাঁর পিতার ছবিকে তাঁর নিজেকে প্রচারপত্র তথা ব্যানার থেকে মুছে দিতে হবে। এটাও জানা যাচ্ছে, কমল গুহর

কমল গুহ তাঁর এলাকার মানুষের প্রয়োজনে নিজের দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতেও পিছপা হননি, বরং প্রত্যেকবারই তিনি সফল হন। কারণ মানুষ তাঁর পিছনে ছিল। উদয়ন গুহ তাঁর পিতা কমল গুহর ছবিকে যদি তাঁর পরিচয়লিপিতে বহন না করতে পারেন, তবে পিতা কমল গুহর সেই ইতিহাসকেও তুলে ধরতে গিয়ে তিনি হোঁচট খেতে বাধ্য। অথচ দিনহাটার মানুষের দরজা খুলে তাদের মনের ঘরে ঢুকতে গেলে যে পিতা কমল গুহ নামের চাবিকেই ব্যবহার করতে হবে।

ছবিসহ সেইসব ব্যানার ইতিমধ্যে সরে গেছে বা যেতে শুরু করেছে।

উদয়নবাবুর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে এই প্রতিবেদকের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তৃণমূল দল ও তার নেত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র আক্রমণাত্মক বক্তব্য শুনে মনে হত, তিনি আর সব চেনা বামপন্থীর থেকেও অনেক বেশি তৃণমূল বিরোধী বামপন্থী। কোনও একটি এই ধরনের চ্যানেলে এই প্রতিবেদকের তাঁর সঙ্গে একই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর ভদ্র ও পরিশীলিত ব্যবহার এই প্রতিবেদককে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু প্রশ্নটা এখানে ব্যক্তিগত পরিচয়ের উদয়ন গুহ নয়। রাজনৈতিক অভিযানে তাঁর জ্যোতিষ্ক পিতা কমল গুহর নামকে বা তাঁর ছবিকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাকে মেনে নিতে তিনি রাজি হবেন কীভাবে? কমল গুহ তো এমন কোনও মানুষ নন, যাঁর বিরুদ্ধে কোনও কলঙ্কের কাদা ছড়িয়ে আছে। কমল গুহ তো একটা সংগ্রামের প্রতীক। সত্যি কথা বলতে, তাঁর পরে ডুয়ার্সের প্রতিনিধিত্ব করার মতো জনপ্রিয় নেতা আজও তৈরি হয়নি।

পরিচয় তো শুধু রাজনৈতিক বা দলের নয়, পরিচয় তো ব্যক্তিরও। দল ভাল হতে পারে, কিন্তু দলীয় প্রার্থীর অতীত ও বর্তমান পরিচয়ও তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তার জন্যই তো গড়ে উঠেছে আরেক ধরনের রাজনৈতিক বিন্যাস। সেটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই আরেক ধরনের গণতন্ত্র। তাকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বলা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক গণতন্ত্র। আরও সোজা কথায় বলতে হয়, পরিবারতান্ত্রিক গণতন্ত্র। জওহরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধি, ইন্দিরার পুত্র রাজীব গান্ধি, এখন রাজীবের পুত্র রাহুল নেতা হয়েছেন। ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের প্রথা মেনে বংশধারা অনুসারে রাজা হয়েছেন এমন বলা যাবে না। তাঁরা পদে এসেছেন ভোটে নির্বাচিত হয়েই। একই কথা বলা যাবে ওড়িশার বিজু পট্টনায়েকের পুত্র নবীন পট্টনায়ক, উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম সিং যাদবের পুত্র অখিলেশ যাদব, শেখ আবদুল্লার পুত্র ফারুক, তাঁর পুত্র ওমর, মুফতি মহম্মদের কন্যা মেহবুবা, চরণ সিং-এর পুত্র অজিত সিং, করুণানিধির পুত্র স্ট্যালিন—সর্বত্রই যে একই ছবি। তবে এখানে সব উত্তরাধিকারীই কিন্তু তাঁদের পিতা অথবা মাতার পরিচয়ের ছবিটাকেই সামনে রেখে মানুষের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। রাহুলরা জানিয়ে চলেছেন তাঁর পরিবারের অবদানের কথা, অখিল জানাচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের নেতাজি, তাঁর পিতা মুলায়ম সিং যাদবের কথা, নবীন জানাচ্ছেন তাঁর পিতার আধুনিক ওড়িশা গড়ার কথা, ওমর বা মেহবুবা জানাচ্ছেন কাশ্মীরের ইতিহাসে তাঁদের পিতার অবদানের কথা। সবাই কিন্তু গর্বের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে আছেন হয় তাঁদের পিতা বা মাতার নাম। ঘোষণা করছেন, জন্মদাতা বা দাত্রীর সংগ্রামী ঐতিহ্যের বাহক হিসেবে তিনিও তাঁদের মতো প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে প্রত্যয়ী।

কমল গুহ তাঁর এলাকার মানুষের প্রয়োজনে নিজের দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতেও পিছপা হননি, বরং প্রত্যেকবারই তিনি সফল হন। কারণ মানুষ তাঁর পিছনে ছিল। উদয়ন গুহ তাঁর পিতা কমল গুহর ছবিকে যদি তাঁর পরিচয়লিপিতে বহন না করতে পারেন, তবে পিতা কমল গুহর সেই ইতিহাসকেও তুলে ধরতে গিয়ে তিনি হোঁচট খেতে বাধ্য। অথচ দিনহাটার মানুষের দরজা খুলে তাদের মনের ঘরে ঢুকতে গেলে যে পিতা কমল গুহ নামের চাবিকেই ব্যবহার করতে হবে। উদয়নবাবুকে ভাবতে হবে, সেটা করতে গেলে তাঁর বর্তমান দলের সর্বময়ী কর্ত্রীর উপর তাঁর বাবার সংগ্রামী পরিচয়ের ইতিহাসকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলছেন কি না। দলের ভিতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই পাহারাদারির চোখ অত্যন্ত সচল। তৃণমূল দলের মধ্যে অনেকেই যেমন উদয়নবাবুর আগমনকে ভালভাবে মেনে নিতে পারছেন না, তেমনি উদয়নবাবুর পুরনো দল ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যরা অনেকেই তাঁদের ক্ষোভ আজও পুষে রেখেছেন।

দিনহাটা শহরের মানুষ, যাঁরা গত পুরভোটে উদয়নে আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন, তাঁরা উদয়নের এই শিবির পরিবর্তনে দৃশ্যতই অখুশি। সূত্রের খবর, আহত সিংহের মতোই ফ.ব. কর্মী ও নেতারা নাকি দল বেঁধে ফন্দি আঁটছেন আসছে ভোটে উদয়নকে এর সমুচিত জবাব দেওয়ার। নতুন দলের ভোটারদের আস্থা অর্জন এবং পুরনো দলের ভোটারদের যতটা সম্ভব নিজের দিকে নিয়ে আসার কঠিন কাজ দু'টি কিন্তু করতেই হচ্ছে তাঁকে। তার উপর কমল গুহর সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জনের চেষ্টাটুকুও বিফলে গেল। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, উদয়নবাবুর রাজনৈতিক শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে হয়নি, অনেকটা রাজাদের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মসনদের মতোই। বাবা বেঁচে থাকতে যেমন জিতে দেখাতে পারেননি, তেমনি গত বিধানসভায় তাঁর জয় ছিল তৃণমূলের সরাসরি লড়াই না করার উপহার। বাবার কাছ থেকে রাজনীতির পাট উদয়ন কতটা নিয়েছিলেন তা এখন বলা সম্ভব নয়, তবে আজকের রাজনীতিতে প্রয়োজন হলে যে পিতৃপরিচয়ও ভুলতে হয় তা সম্ভবত তাঁর অজানা ছিল।

পুরনো দলীয় কর্মীদের অভিমত হল, এই 'নীতিহীন' শিবির পরিবর্তনের মাশুল উদয়নকে দিতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও দিতে হবে। যে যা-ই ব্যাখ্যা দিক না কেন, তার আসল বিচারক কিন্তু সময়। রাজনীতির ময়দানে সেই কবে থেকে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখি আমরা। তাই শেষ পর্যন্ত উদয়ন যদি সব মাশুল চুকিয়ে জয়ের হাসি হাসতে পারেন, তখন তাঁকে নিয়ে যাবতীয় ধ্যানধারণা, অপবাদ-মতবাদ আমূল বদলে যেতে পারে।

সৌমেন নাগ

উদয়ন ও কমল গুহ। পিতা-পুত্রের পুরনো একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে।

বিরোধীদের শেষ ভরসার উত্তর

শিলিগুড়িতে বাইচুং মমতার 'ব্লাইন্ড কল' নাকি 'ওয়াকওভার ?'

এরকমই প্রশ্ন ঘুরছিল মানুষের মনে। অনেক জল্পনার শেষে আচমকা বাইচুং-এর নাম ঘোষণা প্রাথমিক ভাবে অবাক করেছিল বিরোধী প্রার্থী স্বয়ং অশোক ভট্টাচার্যকেও। তার পর অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়ে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েছেন, এক বুক আশা নিয়ে। অশোকবাবুর প্লাস পয়েন্ট পরপর দুটি নির্বাচনে শাসকদলের বিরুদ্ধে বিরোধী জোট করে জয়ের মুখ দেখেছেন, ফলে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। এবারও বাম-কং জোটে দুইয়ের ভোট এক হয়ে যাবে এ ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী তিনি। তার ওপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস পাহাড়ে প্রার্থী না দিয়ে মোর্চাকে অনেকটাই মানিয়ে ফেলেছেন, শিলিগুড়িতে মোর্চা ভোটও পড়বে তাঁরই পক্ষে। অতএব সব মিলিয়ে তার জয়ের সম্ভাবনা প্রবল বলেই প্রাথমিক ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

অন্যদিকে 'বহিরাগত' বাইচুংকে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জীর্ণ এবং সাংগঠনিকভাবে দুর্বল তৃণমূল শিলিগুড়িতে কতটা সাপোর্ট দিতে পারবে এ নিয়ে সন্দিহান কমবেশি সবাই। কিন্তু হাল ছাড়তে যে রাজি নন স্বয়ং বাইচুং ভুটিয়া, তা যত দিন যাচ্ছে তা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে যেহেতু বলেছেন শিলিগুড়ি থেকে তাঁকে জিতিয়ে আনবেন, অতএব দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে প্রচারের কাজে লাগানোর উদ্যম চোখে পড়বার মতই। গত লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে তৃণমূল দলটির গঠন-রীতি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাকেই বাইচুং যে এবার কাজে লাগাতে ইচ্ছুক তা তাঁর বডি ল্যাংগুয়েজে স্পষ্ট।

২০১৪ সালের দার্জিলিং লোকসভায় বাইচুং হেরেছিলেন মোর্চা তথা বিজেপি-র কাছে, বাম প্রার্থীর কাছে নয়। বরং শিলিগুড়ি বিধানসভায় বাইচুং পেয়েছিলেন ৫১২০৪, সিপিএম ৩১৪০৪ এবং কংগ্রেস ১৩২৬২। ২০১১-র নিরিখে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কমেছে হাজার ছয়েক কিন্তু বাম ভোট কমেছে ৩৬০০০। বলাই বাহুল্য এর পুরোটা গিয়েছে বিজেপির বাক্সে। এবার কি সেই ভোট ফেরৎ চলে আসবে আশা করছেন অশোকবাবু? পৌরসভার ভোটে শিলিগুড়ি বিধানসভার ৩৩ ওয়ার্ডে হাজার পাঁচেক এগিয়ে থাকলেও তা যে ওয়ার্ড স্তরে তৃণমূলী গোষ্ঠী লড়াই ও গোঁজ প্রার্থীর পরিণাম তা সম্ভবত আশোকবাবুও জানেন। তাই বোধহয় বাইচুং নিয়ে তাঁর প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত মন্তব্য ছিল, পচা শামুকেও পা কাটে। ২০০৬ সালের প্রাপ্ত এক লাখ সতের হাজার ভোট পাঁচ বছরেই পঞ্চাশ হাজার কমে ২০১১ সালে গিয়ে হয়েছিল সাতষট্টি হাজার— সেই ভয়ানক স্মৃতি এবং এতে তাঁর নিজের অবদান কতটুকু ছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এই পোড় খাওয়া বাম নেতা।

এ সময় শিলিগুড়িতে টানা কয়েকদিন ক্যাম্প করে মমতা ব্যানার্জি যে বার্তা দিলেন তার মর্মার্থ দিনের আলোর মতই পরিষ্কার— শিলিগুড়ি তার কাছে প্রেস্টিজ ফাইট, এই আসন নিয়ে স্থানীয় নেতাদের কারও ওপর ভরসা করতে চাননি তিনি। বাইচুংকে প্রার্থী করে তিনি যেমন শিলিগুড়ির তৃণমূল নেতাদের ধন্ধে ফেলেছেন তেমনই একই ঢিলে অনেকগুলি পাখি মারার কাজ হয়ে গেল তাঁর। এই কয়েক দিনে তাঁর উপস্থিতিতে সংগঠন যতটা চাঙ্গা হবে ততই কপালে ভাঁজ ফেলতে পারবেন অশোকবাবুর। শিলিগুড়ির তৃণমূল কতটা সচল হয় শেষ পর্যন্ত সেটাই দেখার।

তরাই-ডুয়ার্স থেকে এবার কংগ্রেস কি বিদায় নিচ্ছে?

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি গতবারের এই দুটি জেতা আসন কংগ্রেস বামকে ছেড়ে দিচ্ছে কেন সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সাধারণ মানুষ এবং স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা। অঙ্ক কিন্তু দুটো সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরছে। এক, দুটি কেন্দ্রেই কংগ্রেসের ভোট সংখ্যায় সবচাইতে কম, বিজেপির চাইতেও কম। গত দুই কেন্দ্রেই জয় এসেছিল তৃণমূলের ভোট যোগ হওয়ায়। এবার হাজার জোট হলেও আসএসপি-র ভোট চিরশত্রু 'হাত'-এ পড়বে সেই সম্ভাবনা নেই। দুই, মালদহ-মুর্শিদাবাদ-উঃ দিনাজপুর-এ হেভিওয়েট নেতাদের মতো কংগ্রেসের এখানে এমন কেউ নেই যে গলাবাজি করে সিট দুটি আদায় করতে পারতেন। দেবপ্রসাদ রায় নীতিহীন জোটে নেই গোড়া থেকেই বলে আসছেন, আর সুখবিলাস বর্মা সরাসরি না বললেও দাঁড়াবেন না সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। এই সুযোগে ওই দুটি সিট বাম দলকে ছেড়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদে নিজের দুটি আসন বেশি রাখা যায় কি না সেই চেষ্টায় আছেন অধীর চৌধুরী। একে আখের গোছানো ছাড়া আর কি বলা যায়? কংগ্রেস তরাই-ডুয়ার্সের বাকি যেসব কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে সেগুলির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, কংগ্রেসের একার ভোট কোথাওই বেশি নয়। অন্তত ২০১৪ সালের প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে কংগ্রেসের একার ভোট সবকটি আসনেই তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে (একমাত্র কালচিনি কেন্দ্রেও কিছুটা ভদ্রস্থ)। এই অবস্থায় ভোটে লড়তে গেলে পুরোপুরি বাম ভোটের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাটা বোধ হয় কোনও মতেই কাম্য নয়। আর কত শতাংশ বামপন্থী ভোটারের শেষ পর্যন্ত হাত চিহ্নে বোতাম টেপার মানসিকতা হবে তা নিয়ে সংশয় থাকছে বইকি। সুতরাং তৃণমূলের 'নেগেটিভ' ভোটই সম্ভবত তাদের একমাত্র ভরসা।

বাম-কং জোট নিয়ে কিছু প্রশ্ন

যারা গত পাঁচ বছরে তৃণমূলের দাপটে পর্যদুস্ত, তৃণমূলের ট্যাগ লাগানো খুন-ধর্ষণ-তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে তিতিবিরক্ত তারা বাম-কং জোট হবে শুনে প্রথমে মনে মনে আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু দিন যতই যেতে লাগল জোটের পরিণাম নিয়ে সংশয় দেখা দিল দুই শিবিরেই। রাজ্যের প্রত্যন্ত তিন জেলায় তরাই-ডুয়ার্সের বাম এবং কংগ্রেস কর্মী-নেতাদের মনে আজ যে সব প্রশ্ন জাগছে

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি গতবারের এই দুটি জেতা আসন কংগ্রেস বামকে ছেড়ে দিচ্ছে কেন? আসলে মালদহ-মুর্শিদাবাদ-উঃ দিনাজপুর-এর হেভিওয়েট নেতাদের মতো কংগ্রেসের এখানে এমন কেউ নেই যে গলাবাজি করে সিট দুটি আদায় করতে পারতেন। এই সুযোগে ওই দুটি সিট বাম দলকে ছেড়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদে নিজের দুটি আসন বেশি রাখা যায় কি না সেই চেষ্টায় আছেন অধীর চৌধুরী। একে আখের গোছানো ছাড়া আর কি বলা যায়?

সেগুলি কেমন?

১) এ কেমন জোট যেখানে এক মঞ্চ থেকে যৌথ প্রচার নাকচ দেওয়া হয়েছে প্রথমেই?

২) এ কেমন জোট যেখানে একই সঙ্গে হচ্ছে কেরালায় ভোট সেখানে দুই দল যুযুধান—সচেতন ভোটারের মনে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না?

৩) নিজেদের পায়ের তলার মাটি রাখতে এই অপছন্দের জোট বাঁধছেন যে নেতারা তারা কি ভোটারদের মানসিকতা নিয়ে আদৌ ভাবছেন?

৪) যখন, বাম সরকারের সূর্য যখন মধ্য গগনে ছিল তখন থেকে আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের যে সব ভোটার ধ্রুবকের মতো অপরিবর্তিত রয়েছে তারা কাস্তে বা সিংহ বা কোদাল বেলচার বোতাম টিপবেন বলে মনে হয়?

৫) তৃণমূল হটিয়ে ফের গদি দখলের সম্ভাবনা যখন অতি ক্ষীণ তখন বাম ভোটারদের ৩০-৪০-৫০ বছরের অভ্যাস ছেড়ে হঠাৎ হাত চিহ্নে ভোট দেওয়ার প্রবৃত্তি জাগবে তো?

৬) কংগ্রেসের গোঁজ প্রার্থী দাঁড়াবার সংস্কৃতি এবারও বজায় থাকবে, বামদল সেক্ষেত্রে কী করবেন?

৭) জোট নিয়ে আশাবাদীরা ভোটের পর জোটের অঙ্ক কী হতে পারে ভেবে দেখেছেন? সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী আর কংগ্রেসের উপমুখ্যমন্ত্রী? বাংলার রাজনৈতিক নতুন যুগে সূচনা? নাকি কংগ্রেস আগের মতই ‘আধা-অস্পৃশ্য’ হয়ে থাকবে?

কংগ্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই সংশয়

এবার পুত্রের আবদার মেনে নিলেও মায়ের কড়া সতর্কতা, খবরদার প্রকাশ্যে মমতার বিরুদ্ধে কোনও বিবৃতি নয়, যা করবে আড়াল থেকে। কারণ মাথায় রাখতে হবে ২০১৯ সালের পার্লামেন্ট। দলের ভাবী কান্ডারী হতে যাচ্ছে যে পুত্র তার যুক্তিতে বিরোধিতা না করলেও সোনিয়াজি হিসেব করে দেখে নিয়েছেন এই জোট মমতার জয়ের পথে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারবে না। আর তাই ভোট মিটে গেলে মমতার যেটুকু রাগ অভিমান থাকবে সেটুকু মুছে ফেলে আলিঙ্গনে খুব একটা বেগ পেতে হবে না বলেই তার বিশ্বাস। হাতে তো এখনও বছর দুয়েক থাকছেই। দিল্লির মিডিয়া মহল সূত্রে জানা যাচ্ছে এমনটাই। তাদের মত, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কংগ্রেস সাইন বোর্ড লাগিয়ে এখনও যে গুটিকয় নেতা রয়েছেন তাদের গুরুত্ব সোনিয়াজির কাছে আদৌ কতটুকু যে কেউই আন্দাজ করতে পারে। যাবতীয় সমীক্ষা বা আইবি রিপোর্টে কংগ্রেসের আসন এ রাজ্যে এবার যে নেমে আসবে কুড়ির নিচে, সে খবর নিশ্চয়ই হাইকমান্ডের অজানা নয়।

সাধারণ মানুষের কাছে আজ স্পষ্ট, বিশেষ করে আসন তালিকা প্রকাশের পর, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই জোট চাইছেন অধীর চৌধুরীর মতো মালদহ-মুর্শিদাবাদ এলাকার নেতারা যারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন তৃণমূলের প্রবল পরাক্রমের মুখে দলকে টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। আর তাঁদের হাওয়া দিচ্ছেন সোমেন-মান্নানের মতো মানুষ, যাঁদের রাজনৈতিক সন্ন্যাস

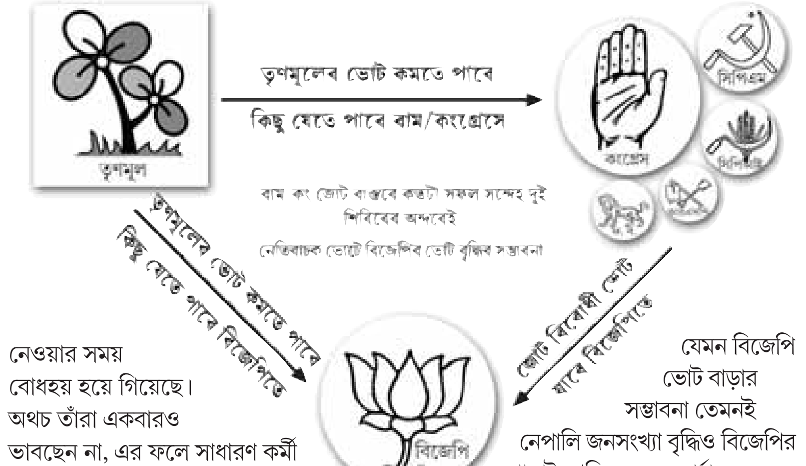

নেওয়ার সময় বোধহয় হয়ে গিয়েছে। অথচ তাঁরা একবারও ভাবছেন না, এর ফলে সাধারণ কর্মী সমর্থকদের কাছে দলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন জাগবে তেমনই বন্ধ হয়ে যাবে সোনিয়া গান্ধির দরজা। যেমন জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়িতে কংগ্রেস কর্মীরা ইতিমধ্যেই ঠাট্টার সুরে বলতে শুরু করেছে গত বিধানসভায় তৃণমূলের সঙ্গে, এবার লাল-এর সঙ্গে, সামনের বার কি তবে বিজেপির সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে?

উত্তরবঙ্গে বিজেপি ভোট কমবে না, বাড়তে পারে

শতাংশের হিসেবে তৃণমূলের ভোট কিছুটা হলেও কমছে এ নিয়ে সংশয় নেই তৃণমূলের অন্দরেও। জোট প্রার্থীরা আশা করছেন সেই ভোট তাদের দিকে আসবে। তাদের আরও আশা, মোদি হাওয়া অস্তমিত, কেন্দ্রে বিজেপির অসমর্থনযোগ্য কার্যকলাপ এবং রাজ্যে বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিরক্ত মানুষ, সবমিলিয়ে বিজেপির ভোট কমবে এবং তা যাবে জোট প্রার্থীর বাক্সেই। কিন্তু ২০১৪ সালের ভোটের ফল দেখায় তাতে মোদি ফ্যাক্টর বাদ দিলেও বিজেপির ভোট বাড়ারই ইঙ্গিত দেয়। গত বছর পৌরসভা নির্বাচনে বিজেপির ফল দেখে বিধানসভায় বিজেপির শক্তির আন্দাজ করাটা বোধ হয় ভুল হবে।

১) তৃণমূলের নেগেটিভ ভোট যা মূলত বামফ্রন্টের নেগেটিভ ভোট হিসেবে এক সময় তৃণমূলের বাক্সে জমা পড়েছিল আজ তা বামে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম, গেলে বিজেপিতে যাওয়ারই যুক্তি বেশি।

২) জোট বিরোধী কংগ্রেস ভোটের একাংশ তৃণমূলে যাবে না, যাবে বিজেপিতেই। বামেদের ক্ষেত্রে একথা বলা মুস্কিল কিন্তু ২০১৪ সালের ফল খালি বিশ্লেষণ করলে একটাই কথা আসে, কে বলতে পারে শেষ ফল কী হবে!

৩) ডুয়ার্স-তরাইয়ের আদিবাসী-তপশিলী বেল্টে যেমন বিজেপি ভোট বাড়ার সম্ভাবনা তেমনই নেপালি জনসংখ্যা বৃদ্ধিও বিজেপির পাল্লাই ভারি করছে। মোর্চার পাশাপাশি, কেপিপি, আদিবাসী পরিষদ ইত্যাদি দলগুলিকে সঙ্গে টানতে পারলে চা বলয়ে এবার বিজেপি-র খাতা খুললে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

৪) বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে গোরু পাচার, অনুপ্রবেশ, সাম্প্রতিক নাশনকতামূলক কার্যকলাপ যে পরিমাণে বাড়ছে তাতে হিন্দু ভোটারদের একটি বড় অংশের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রতিফলন ঘটাচ্ছে ভোটের বাক্সে। ভোটের জন্য সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতির বিরুদ্ধে এইসব মানুষ উত্তর দিতে চায় ইভিএম যন্ত্রেই।

আলিমুদ্দিনের তেরঙ্গায়নে এবং প্রদেশ কংগ্রেসের অতিরিক্ত বাম তেলমর্দনে স্পষ্টতই হতাশ নিচুতলার বহু কর্মী, যাদের কাছে জোট তখনই গ্রহণযোগ্য যখন সেখানে নিজের দলের প্রার্থী থাকবে, অন্য দলের প্রার্থীর জন্য অন্ধের মতো খেটে মরার কোনও ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না তারা। অতি সম্প্রতি কোনও একটি পঞ্চায়েতে দলীয় মিটিং-এ কংগ্রেসের এক তরুণ নেতা সংক্ষিপ্ত ভাষণে পরিষ্কার বললেন, এরকম চলতে থাকলে দলবল নিয়ে সোজা যোগ দেব বিজেপিতে, একমাত্র বাঁচার উপায় সেটাই।

কলকাতার মিডিয়া জগতের বিশেষজ্ঞরা যারা জোটের পাটিগণিত নিয়ে জোর নাড়াচাড়া করছেন একের পর এক ‘স্টোরি’ করবেন ভেবে তাঁরা কি এসব খবর রাখছেন?

বিশেষ প্রতিবেদন

আসছে ভোট। বাঁধছে জোট।
পাকছে ঘোঁট। উড়ছে নোট।
জলদি ছোট। দেদার লোট।
লাগল কি চোট? ফাটল কি ঠোঁট?
পেলি কত মোট? এইবেলা ফোট

—ছন্দা মিত্র

হুজুর কুজুর

ওফ! খেল দেখালেন বটে ডুয়ার্সে কুজুর সাহেব। একই সঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আর বিধানসভার প্রার্থী! এমন কাণ্ড ভবে ক'টা ঘটেছে বাপ? ডুয়ার্সে তো ঘটেইনি। এর ফলে গিনেস বুকে ডুয়ার্সের নাম তোলা যায় কি না, তা নিয়ে জোর গবেষণা। তবে এটাও নাকি ভাবায় যে, জেলে বসে যদি প্রার্থী হওয়া যায়, তবে থানায় বসে কেন হওয়া যাবে না? গিনেস এই রেকর্ড মানবেই না।

আর পার্টি আপিসের জায়গা হিসেবে থানার কোনও বিকল্প হয় রে দাদা!

বংশী ভ্যানিশ

গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে বংশীবদন বর্মন ক'দিন আগে রেল অবরোধ করে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। ননস্টপ অবরোধ শেষে পুলিশ এসে ওঠায়। কিন্তু অবরোধ তুলে দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বংশীবাবু হাওয়া। তাঁর ডাকে যারা রেল রোকো আন্দোলনে এসেছিলেন, তাঁরা নাকি বলছেন যে, বংশীবাবু তাঁদের বলেছিলেন, রেল আটকালে বিদ্যুতের বিল আর ব্যাঙ্কের লোন মকুব হবে। এই কারণেই তাঁদের আসা। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা হল, যাঁর ডাকে আসা, সেই নেতাই কেন ভ্যানিশ? নেতা তো সবার আগে থাকেন। সবার আগে তো পালান না! শুনে পুলিশ নাকি মুচকি হেসে বলেছে, আমাদের দেখে রামদেব বাবা অব্দি সালোয়ার কামিজ পরে মেয়েদের মধ্যে লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। বংশীবাবু বরং ইন্টেলিজেন্ট।

পুলিশের নাম? বলা যাবে না। সে বেচারা দেশদ্রোহিতার কেস খেলে আপনি বাঁচাবেন?

অবাকচু

মানে অবাক কচু। মানে, কচু দেখে অবাক। ডুয়ার্সে হেথা-হোথা রাশি রাশি কচু গাছ বর্ষার দিনগুলিতে চোখে পড়তে বাধ্য। পেল্লায় সাইজের কচু পাতা, যা কিনা ছাতার কাজ করে— সেও দেখা যায় যথেষ্ট। কচু এখানে এমনিই হয়। একটু যত্ন নিয়ে চাষ করলে তো আহ্লাদে বাড়ে। সরষে বাটা দিয়ে কচুর লতি কিংবা ইলিশ মাছে কচু— খাদ্য হিসেবে কচুর খাতির কম নয় কিন্তু! ইদানীং ডুয়ার্স জুড়ে কচুর চাষ জোর কদমে চলছে। হাটেবাজারে কচুর বিক্রিও বেড়েছে দেদার। পছন্দসই একখানা কচু পনেরো টাকার নিচে মিলবে না। তাচ্ছিল্যের কচু বেচেই টু পাইস কমিয়ে নিচ্ছেন ডুয়ার্সের অনেক চাষি।

সে জন্যই বললাম 'অবাকচু'। তাহলে ব্যাপারটা একটু বিদেশি বিদেশি শোনাবে।

মাঠের কথা

খুব কম চেষ্টায় পা মচকাতে কিংবা আছাড় খেয়ে কলার বোন খুলে ফেলতে হলে আপনি কী করবেন? দিনহাটার লোকের পরামর্শ হল, স্থানীয় সংহতি ময়দানে কিঞ্চিৎ দৌড়াদৌড়ি করলেই আপনার ইচ্ছেপূরণ হবে। যদিও সেটা দিনহাটার বড় সাধের খেলার মাঠ, কিন্তু বাস্তবে সেটা বর্ষায় সংহতি দিঘি, বাকি সময়টা সদ্য ফসল-তোলা খেত। হয় এখানে মাছের চাষ হোক অথবা ধান-পাট লাগাক সরকার। আজকাল টিভিতে দেখা যায় এবড়োখেবড়ো, উঁচুনিচু, ঢিপিওয়ালা রাস্তায় বাইক-সাইকেল রেস হচ্ছে— সেসব খেলা চালু করতে চাইলে অবশ্যি সংহতি ময়দানের মতো জায়গা আর নেই। কিচ্ছু বানাতে হবে না। কিন্তু ফুটবল, ক্রিকেট, দৌড়াদৌড়ি, লম্ফঝম্প? খবরদার! এই সে দিন নাকি কোন এক খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে ডাকা হয়েছিল সেই ময়দানে খেলার জন্য। কিন্তু সংহতি ময়দান শুনেই কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। আর স্টেডিয়াম? পাগল নাকি? স্টেডিয়াম বানালে কে আর মাঠে প্র্যাকটিস করবে? স্টেডিয়াম সে তুলনায় অনেক ভাল জায়গা হবে যে!

শর্ট সার্কিট

জলপাইগুড়িতে হাই কোর্টের সার্কিট বেঞ্চ কবে হবে তা অতি রহস্যময় জিজ্ঞাসা। অচিরেই যে এই বেঞ্চের দাবিতে আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী হবে, তা নিয়ে অবশ্যি শহরবাসীর সন্দেহ নেই। শেষ খবর ছিল, বেঞ্চের জন্য পাহাড়পুরের কাছে জাতীয় সড়কের পাশে সত্তর একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল রাজ্য সরকার। ইদানীং জানা গেল, জমিদাতারা বেজায় চটে গিয়ে এই বলে হুমকি দিচ্ছেন যে, জমির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিলে আসন্ন বিধানসভার ভোটে তাঁরা নোটা'য় ছাপ দেবেন। জমির বেশ খানিকটা নাকি সার্কিট বেঞ্চের জন্য না রেখে প্লট করে বেচে দেওয়া হচ্ছে। আর তা বিকোচ্ছে আগুনের দামে। হাই কোর্টের সার্কিট বেঞ্চ-এর কাছাকাছি থাকা বলে কথা! দাম হবে না! বেঞ্চ যে তিন মাসের মধ্যে চালু হচ্ছে, তা বছরে দু'বার ঘোষণা করাটা এখন শহরবাসীর সয়ে গিয়েছে। ভোট পেরুলেই যে বেঞ্চে বিচারপতিরা এসে বসবেন, সেটাও শোনা যাবে প্রচার শুরু হলেই। পুজোর আগে চালু হওয়ার কথা তো বর্ষা এলেই শোনা যায়। মহালয়ার পরে জানানো হয় যে, শীতকালেই শুরু হচ্ছে। শীতের শুরুতেই যে একটি টেকনিক্যাল সমস্যা খুঁজে পাওয়া যাবে— এটাও শহরবাসীর জানা।

অতএব জমি নিয়ে বিক্ষোভটা নেহাতই একটা শর্ট সার্কিট। ওরে পাগল! সার্কিট বেঞ্চের ভাগ্যটাই যে শর্ট সার্কিটে ভরা! আরও পঞ্চাশ বছর কাটুক। মেওয়া ফলাবি, সবুর করবিনে?

শতবর্ষে নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি গ্রন্থাগার ঐতিহ্য ফিরে পেল কি?

ঊনত্রিশ খণ্ডে 'বিশ্বকোষ', 'সবুজপত্র', 'আর্যদর্পণ', 'প্রবাসী'— এ ধরনের আরও অনেক পত্রপত্রিকা ছাড়াও সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার প্রচুর বই নিয়ে কোচবিহারের মাথাভাঙায় ১৯১৫ সালে শুরু হল এক গ্রন্থাগার। তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের রাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি গ্রন্থাগার চালু করেছিলেন, যাতে প্রজারা বই পড়ায় আগ্রহী হয়। রাজ-আমল এবং পরবর্তী সময়েও মাথাভাঙা মহকুমার বই পড়া কিংবা অন্যান্য সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারটির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বইপড়ুয়াদের যাতায়াত থেকে শুরু করে পাঠকদের আগ্রহে একদিন গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যাও পাঁচ হাজারে পৌঁছায়। তবে মাথাভাঙা টাউন কমিটির হাত ঘুরে বাম পুরবোর্ডের পরিচালনাতেই চূড়ান্ত অবহেলিত হয় গ্রন্থাগারটি। আটের দশকের গোড়ায় রাজ্য সরকার পাবলিক লাইব্রেরি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নিলেও বাম পুরবোর্ড কিন্তু গ্রন্থাগারের এক্তিয়ার ছাড়ে না। বেহাল অবস্থায় চলতে চলতে একদিন গ্রন্থাগারটির দরজায় পড়ে তালা। রাজ্যপাটে পরিবর্তনের পরও গ্রন্থাগারটির হাল ফেরানোর উদ্যোগ নিতে কেউই আগ্রহ দেখায় না। ক্রমশ ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগারটির অবস্থা আরও জীর্ণ হতে থাকে। এর পর গ্রন্থাগার ভবনের গা ঘেঁষে মাথাচাড়া দেয় পাইস হোটেলের রান্নাঘর। একে একে গ্রন্থাগারের সামনে গজিয়ে ওঠে দোকানপাট, শনি মন্দির। পাশাপাশি বন্ধ থাকা গ্রন্থাগারের ভিতরকার বইপত্র দীর্ঘ অবহেলা আর সংরক্ষণের অভাবে করুণ চেহারা নেয়। বেশ কিছু প্রাচীন পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ নষ্ট হয়। এই অবস্থায় গ্রন্থাগারটি এসে পৌঁছায় শতবর্ষের দোরগোড়ায়। এতকাল যে ভবন এবং গ্রন্থাগারটি নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা ছিল না। অমূল্য বইপত্র বাঁচিয়ে রাখার কথাও ভাবনায় ঠাঁই পেত না, এবার তা নিয়েই ভীষণ নড়েচড়ে উঠল মাথাভাঙা পুরসভার বর্তমান বোর্ড। অথচ বিপন্ন গ্রন্থাগার ভবন ও তার ভিতরকার মূল্যবান গ্রন্থাদি বাঁচানোর কথা একাধিকবার জানিয়েছিল স্থানীয় মানুষ। তারা হেরিটেজ বিল্ডিং-এরও দাবি জানিয়েছিল। কাজ যে তাতে কিছুই হয়নি— এ কথা বলা যাবে না। হেরিটেজ কমিটি রাজ-আমলে তৈরি ভবন, পাশাপাশি গ্রন্থাগারটিও পরিদর্শন করে। সেই কমিটিতে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসবিদসহ জ্ঞানীগুণী একাধিক মানুষই হাজির ছিলেন। রাজ-আমলের ওই ভবন ও গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁরা সবিশেষ ওয়াকিবহাল। তবে প্রতিনিধি দলের অনেকেই এমন একটি গ্রন্থাগারের কথা প্রথম শুনে অবাক হয়েছিলেন। তবে তাঁরা ভবন ও গ্রন্থাগারটির সংরক্ষণ অবিলম্বে করা দরকার, সে কথা জানিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারের গা ঘেঁষে অবৈধ নির্মাণ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তার পরেও কোনও উদ্যোগ দেখতে পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি মাথাভাঙা পুরসভা গ্রন্থাগারটির সংস্কারের কাজ শুরু করে হেরিটেজ কমিটির সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই, নিজেদের তহবিল থেকেই প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয় করে ভবনটির সংস্কারের কাজ তারা সম্পন্ন করে। কিন্তু কাজ শুরু হতেই সংস্কারের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শতবর্ষপ্রাচীন গ্রন্থাগার ভবন হেরিটেজ তকমা পাওয়ার অন্যতম দাবিদার। প্রশ্ন, তার সংস্কারকাজ কতটা বৈজ্ঞানিকভাবে হয়েছে? অর্থাৎ রাজ-আমলের নির্মাণশৈলী বা আদল কতটা অবিকল রাখা গেল? যদিও মানতে হবে, একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার থেকে সংস্কার করে বাঁচিয়ে তোলাটাও ইতিবাচক পদক্ষেপ। অন্য দিকে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আইন অনুসারে ১০০ বছর পেরিয়ে যাওয়া কোনও ভবনের সংস্কার করতে গেলে পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানেই তা করতে হয়। নিদেনপক্ষে পুরাতত্ত্ব বিভাগের গাইডলাইন অনুসরণ করাটাও আবশ্যক। কারণ, প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি না জেনে-বুঝে সংস্কার হলে প্রাচীন ভবনের মূল স্থাপত্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আপাতদৃষ্টিতে সংস্কার হওয়া ভবনটিকে দেখে মনে হয় যে, পুরবোর্ড সংস্কারকাজে প্রাচীন স্থাপত্যের আদলটাকে যথাসম্ভব অবিকল রাখার চেষ্টা করেছে। তবে বদলে ফেলেছে দরজা-জানালা, এমনকি গ্রিলও। সেগুলি প্রাচীন স্থাপত্যের চেহারায় খুবই বেমানান। তার থেকেও বড় কথা, সমগ্র বইপত্রের অধিকাংশটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যেটুকু বেঁচে আছে তা আর ব্যবহার করা যাবে না। গ্রন্থাগারের মূল সম্পদ তো তার সংগ্রহ। সেই মূল্যবান সংগ্রহই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো নতুন বইপত্র দিয়ে নতুন করেই শুরু করতে হবে নতুন গ্রন্থাগার। কেবলমাত্র সংস্কার করা প্রাচীন ভবনে এখন চালু করতে হবে নতুন বইপত্রের সংগ্রহশালা। শতবর্ষের নৃপেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাগার তার ঐতিহ্য ফিরে পেল কি? সেটাই এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচন ঘরের দরজায়। অবহেলিত ভবনের সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাকে ঘিরে ফেলা অবৈধ হোটেল, দোকানপাট, শনি মন্দির সরানো যায়নি। পাঠকদের জন্য গ্রন্থাগারটি খুব শীঘ্রই চালু হবে।

গ্রন্থাগারের ৩০ বছর আগের ও পরের ছবি। তুলেছেন বরুণ সাহা।

মিতা বসু, মাথাভাঙা

আফিম চাষে রেকর্ড ফলন প্রশাসনের প্রশ্রয়ে

গত বছর মালদা জেলায় কুড়ি হাজার বিঘা জমিতে চাষ হয়েছিল। এর মধ্যে বারো হাজার বিঘা জমির চাষ নষ্ট করা হয়েছিল। ওই বছর ফসলের দাম মিলেছিল প্রতি কেজি ৯০ হাজার টাকা থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত। এ বছর জেলায় প্রায় ৮০ হাজার বিঘা জমিতে চাষ হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১৫ হাজার বিঘা জমির চাষ নষ্ট করা হয়েছে। এই হিসেব পোস্ত চাষের। এ বছর যা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। দামের ক্ষেত্রে এবার বেশি চাষ ও ফলন হওয়ায় দাম ৫০ হাজার টাকা কেজিতেই ঘোরাফেরা করবে বলে মনে করছে চাষিরা।

মালদা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানা এলাকাতে পোস্ত চাষ হাল আমলের ঘটনা। তবে এবার শুধুমাত্র ওই এলাকা দু'টিতেই ওই চাষ সীমাবদ্ধ নেই। বেআইনি পোস্ত চাষ ছড়িয়ে গিয়েছে রতুয়া, চাঁচোল, গাজল, সুজাপুর, ইংলিশবাজার, মোথাবাড়ি, কাজিগ্রাম, পঞ্চানন্দপুর, হরিশ্চন্দ্রপুরসহ আরও বহু জায়গাতেই। পোস্ত ফুল থেকে ফল ধরে। সেই ফলের গায়ে ব্লেড দিয়ে কাটলে আঠা বেরিয়ে আসে। ওই আঠা হল আফিম বা পোস্ত আঠা। মালদা থেকে গোটা দেশেই ছড়িয়ে দেওয়া হয় ওই মাদক। পোস্ত আঠা থেকে তৈরি হয় হেরোইনও। এক বিঘা জমিতে যতটা পোস্ত চাষ হয়, তার থেকে প্রায় ৩ কেজি আফিম আঠা সংগ্রহ হয়। প্রতি কেজি আফিম থেকে যদি ৬০-৭০ হাজার টাকা মেলে, তবে তা ধান-গম চাষের থেকে লাভজনক।

পোস্ত চাষ থেকে আফিম উৎপাদন আর বেআইনি ব্যবসার পুরো চক্রটাই নিয়ন্ত্রণ করে মূলত কালিয়াচকের মাফিয়ারা। তারাই চাষিদের বুঝিয়েছে, লোভের ফাঁদে জড়িয়েছে। কিন্তু লাভের মোটা অংশটা নিজেদের দিকেই টেনে রেখেছে। তবে প্রশাসনের চরম উদাসীনতায় বেশি লাভের ওই চাষ এসে ঠেকেছে গৌড়ের বারদুয়ারি, ফিরোজ মিনার, দখলি দরওয়াজার চারপাশে। ঐতিহাসিক ওই স্থাপত্য-ভাস্কর্য দেখতে এসে পর্যটনরাও দেখে ফেলেছেন বিস্তীর্ণ জমিতে ফোটা পোস্ত ফুলের ছবি। এসব তথ্য শুনে-টুনে তো পুলিশ প্রশাসন থেকে মালদা আবগারি দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের চোখ কপালে উঠেছে। কিন্তু তারপর? পুলিশ অভিযান চালিয়ে অনেক খেত নষ্ট করেছে। তবে তার আগে বহু লক্ষ টাকার আফিম পাচার হয়ে গিয়েছে। পোস্ত নষ্ট করতে গিয়ে বৈষ্ণবনগর ও কালিয়াচকে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন আবগারি দপ্তরের কর্মীরা। বহু জায়গায় মাফিয়াদের দাপটে পুলিশও সাহস নিয়ে পৌঁছাতে চিন্তায় পড়ে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত সীমান্তরক্ষীবাহিনীর সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু ততদিনে আফিম থেকে কয়েক কেজি হেরোইন তৈরি হয়ে গিয়ে দেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছে।

মালদা জেলায় পোস্ত চাষ চলছে, সে কথা স্থানীয় পঞ্চায়েত জানে না— এটা মেনে নেওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু তারা গোড়াতে উচ্চবাচ্য করেনি। পরবর্তীকালে গুরুত্ব বুঝেই হোক অথবা এর ফল কতটা মারাত্মক হতে পারে, সেটা অনুমান করেই হয়ত স্থানীয় প্রশাসনের কানে তোলে। প্রশাসন তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা না নিয়ে পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনায় বসে। তারপর পোস্ত চাষ না করার জন্য পঞ্চায়েতকে প্রচারে নামতে বলে। পঞ্চায়েত সেইমতো মাইকে কৃষকরা যাতে পোস্ত চাষ না করে, তার জন্য প্রচার চালায়। কিন্তু চাষিরা ততদিনে মাফিয়াদের লোভের ফাঁদে বেশি টাকা লাভের আশায় বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষ করে ফেলেছে। চাষিরা মাইকে প্রচারের কথা কানে তোলে না।

প্রশাসন যে ঠিক সময় ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, সেটা বোঝা যায় শহর থেকে মাত্র ১২ কিমি দূরে মহদিপুর গ্রামে পঞ্চায়েত এলাকার পোস্ত ফুল দেখলে। শহর থেকে সামান্য দূরে বিঘার পর বিঘা জুড়ে পোস্ত চাষ হচ্ছে, সে খবর পুলিশ জানে না? এ কথা মালদায় থেকে বিশ্বাস করতে হবে? ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সড়ক ছেড়ে ভিতরে ঢুকলেই বারদুয়ারি, যেখানে কয়েকদিন আগে পর্যটন বিকাশে আলো ও ধ্বনিতে ইতিহাস প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল। দেখা গেল, সেই ঐতিহাসিক স্মারকের গা ঘেঁষে পোস্ত গাছের ডগায় ফুটে থাকা সাদা ফুল হাওয়ায় দুলছে। ফুলের পাশাপাশি মাথা উঁচিয়ে রয়েছে বড় বড় ফল। দখলি দরওয়াজা, ফিরোজ মিনারের মতো সৌধের পাশের জমিতে পোস্ত চাষ চলছে অথচ প্রশাসন জানে না? এ কথা জেলাবাসী কোন যুক্তিতে মেনে নেবে? পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে আবগারি দপ্তর হাত-পা গুটিয়ে থাকাতেই এবারের পোস্ত চাষ অন্যান্যবারের রেকর্ড ভেঙেছে। তাদের উদাসীনতাতেই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে আরও কয়েক কেজি মাদকদ্রব্য। সমাজ তথা দেশের যে বিপুল ক্ষতি সাধিত হল, তার দায় কি তাঁরা এড়াতে পারেন?

> মালদা জেলায় পোস্ত চাষ চলছে, সে কথা স্থানীয় পঞ্চায়েত জানে না— এটা মেনে নেওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু তারা গোড়াতে উচ্চবাচ্য করেনি। পরবর্তীকালে গুরুত্ব বুঝেই হোক অথবা এর ফল কতটা মারাত্মক হতে পারে, সেটা অনুমান করেই হয়ত স্থানীয় প্রশাসনের কানে তোলে।

মৃদুল হোড়, ইংলিশ বাজার

ফের ডাইনি অপবাদ ঃ লজ্জায় মুখ ঢাকল মালদা

আদিবাসী অধ্যুষিত অজগ্রাম, নয়া জেলা শহর, সংলগ্ন পাড়া থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত এলাকা— এরকম সব জায়গাতেই ঘটল পরপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, যা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে শুধু প্রযুক্তি কিংবা বিজ্ঞানের প্রগতিকে লজ্জা দেয় না, সভ্যতা-সংস্কৃতির মুখেও থুতু ছিটিয়ে দিল। উপমা অথবা বাক্যের অলংকার খুব ছেঁদো মনে হয়। কারণ এর থেকে নিন্দনীয় আর কী হতে পারে, যখন পাঁচ দিনের চারটি ঘটনায় আক্রান্ত হন মহিলারাও। ঘটনাগুলি কী? তাদের ডাইনি সন্দেহ করে অথবা ডাইনি অপবাদ দিয়ে নির্যাতন চালানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা মালদা জেলার হবিবপুর থানার বুলবুলচণ্ডী এলাকার লোটাগ্রাম। ওই গ্রামের ৫০ বছর বয়সি এক আদিবাসী মহিলাকে ডাইনি সন্দেহ করে তাঁরই নিকট আত্মীয় মঞ্জু টুডু খুন করার চেষ্টা করে। তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করা হয়। যদিও অভিযুক্ত ধরা পড়ে না। তবে পুলিশ এ কথা বলে, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরেই এমন ঘটনা। যে ঘটনার ঠিক ২৪ ঘণ্টা পরই মালদা শহরেই ঘটে যায় একই ধরনের নিন্দনীয় ঘটনা। শহরের মালঞ্চপল্লির ৪০ বছর বয়সি এক মহিলাকে কিছু লোক তাঁর চুল কেটে, মুখে কালি লাগিয়ে, জুতোর মালা পরিয়ে নির্মম নির্যাতন চালাল। এবারও পাঁচজনের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হল। কিন্তু পাঁচজন অভিযুক্তর একজনকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারল না। ফের ডাইনি সন্দেহে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা মালদহ জেলাতেই। পরপর তিন দিনের ওই ঘটনা হবিবপুরের জাজোইলের কাঁঠালবানপুর গ্রামে। ওই গ্রামের ষাটোর্ধ্ব এক আদিবাসী প্রৌঢ়াকে ডাইনি সন্দেহে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করে পড়শি এক মোড়ল রতন মুর্মু। ঘটনাগুলি যতই ভয়ংকর কিংবা লজ্জাজনক হোক না কেন, পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা যেমনটাই হোক না কেন, কিছুতেই যেন থামতে চায় না। কোনও নিন্দা কিংবা সমালোচনাতেই যেন বাধা পেতে চায় না। প্রতিরোধের ব্যবস্থা তো প্রশ্নচিহ্ন মাত্র। হয়ত সেই কারণেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দৌলতনগরে। এবারও ডাইনি অপবাদ দিয়ে একই পরিবারের তিনজনের উপর নির্যাতন চালাল কিছু লোকজন। স্থানীয় থেকে উচ্চস্তরের পুলিশ প্রশাসন এমন নিন্দনীয় ঘটনা প্রতিহত করতে যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি ঘটনার পিছনে রয়েছে সালিশি সভা বসিয়ে ফতোয়া দেওয়া। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি এবং মোড়ল-মাতব্বরদের নেতৃত্বেই চালানো অত্যাচারের অভিযোগ। এমনকি ওই ধরনের সালিশি সভা কোথাও বসেছে, পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে, পঞ্চায়েত সদস্যরাই সেই সালিশিতে অংশ নিয়ে ডাইনি বলে চিহ্নিত করে শাস্তি বিধান দিয়েছেন।

মনে পড়ছে প্রায় ২৪ বছর আগের কথা। এরকমই নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেছিল মালদা জেলাতেই। সুকনা দিঘিতে একই পরিবারের ছ'জনকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল ডাইনি সন্দেহে। কিন্তু তারপর মালদা জেলা দিয়ে অনেক জলস্রোত বয়ে গিয়েছে। রাজপাটে পালাবদলও হয়েছে। পরিবর্তনের ঝড় তো এখনও বইছে। তবে কীভাবে সেই কুপ্রথা-কুসংস্কার অন্ধকার থেকে ফিরে এল আলোকময় রাজ্যে? উন্নয়ন আর অগ্রগতির মাটিতে এ কাজ তো কোনওভাবেই শোভা পায় না। যে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষককে শিক্ষা দিতে ক্যাম্পাস থেকে কলার ধরে বাইরে আনার হুমকি দেওয়া যায়, সে রাজ্যে ডাইনি সন্দেহে মোড়ল-মাতব্বর-পঞ্চায়েত সদস্যরা মানুষ খুন করার চেষ্টা করে কোন সাহসে? জেলার বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী বিশিষ্টরা বলছেন, আগে ডাইনি সন্দেহ বা অপবাদ দেওয়াটা ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার, কিন্তু সাম্প্রতিককালের ঘটনায় মিলছে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি। অতীত আর বর্তমান মিলিয়ে এই যে মৌলিক পার্থক্যটা উঠে আসছে, সেটা তো কম বড় সামাজিক সমস্যা নয়। প্রশাসন তাহলে শক্ত হাতে লাগাম ধরছে না কেন? প্রাথমিক অবস্থা থেকেই যদি প্রশাসনের তরফে গা-ছাড়া ভাব থাকে, তবে তো তা প্রসারিত হতেই থাকবে। ঘটেছেও তা-ই। একটি ঘটনার পর আরেকটি, তারপরও আবার। অথচ প্রশাসন প্রথম ঘটনার পরও যথেষ্ট সচেতন হল না। ঘটনাকে আমল দিল না। অভিযুক্তরা ধরা পড়ল না। জেলাতেই অন্যত্র ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, তন্ত্রমন্ত্র সাধনা ইত্যাদি ঘটনা চলতে থাকল। পাশাপাশি গ্রামের মোড়ল-মাতব্বর, এমনকি পঞ্চায়েত সদস্যরা রাতে সালিশি সভায় পিটিয়ে অথবা কুপিয়ে খুনের নিদান দিল। পুলিশ তরফে সেই একই বুলি, দেখা হচ্ছে, খোঁজ চলছে। অন্য দিকে, অভিযুক্তরাও ধরা পড়ছে না, আর একটির পর দু'টি-তিনটি-চারটি নির্যাতন-অত্যাচারের ঘটনা ঘটে গেল। তবে কি মালদা জেলায় ফের মাথাচাড়া দিল ডাইনির মতো কুপ্রথা? নাকি পরিবর্তনের ছন্দে ডানা মেলে ডাইনি প্রথার কারণ বদলে গেল? প্রশাসনই তো জানাচ্ছে, কুসংস্কার নয়, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জের।

রণজিৎ দাস, মালদা

প্রায় ২৪ বছর আগের কথা। এরকমই নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেছিল মালদা জেলাতেই। সুকনা দিঘিতে একই পরিবারের ছ'জনকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল ডাইনি সন্দেহে। কিন্তু তারপর মালদা জেলা দিয়ে অনেক জলস্রোত বয়ে গিয়েছে। রাজপাটে পালাবদলও হয়েছে। পরিবর্তনের ঝড় তো এখনও বইছে। তবে কীভাবে সেই কুপ্রথা-কুসংস্কার অন্ধকার থেকে ফিরে এল আলোকময় রাজ্যে?

আমরা নষ্ট করে ফেলেছি নদীর গতিশীল ভারসাম্য

নদীবিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর খ্যাতি দুনিয়া জুড়ে। আমাদের দেশের নামকরা বিজ্ঞানীরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। অথচ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেশকে দেখাতে পারে সঠিক দিশা। এ ক্ষেত্রে কল্যাণ রুদ্র ব্যতিক্রম। দেশের অন্যতম সেরা ভূগোল শিক্ষক এখন পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান। তাঁর কাছে উত্তরবঙ্গে প্রবাহিত নদীগুলির কথা জানতে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন রেখেছিল 'এখন ডুয়ার্স'।

প্রশ্ন: উত্তরবঙ্গের নদীগুলো কীভাবে ডুয়ার্স অঞ্চলটি গঠন করল?

কল্যাণ রুদ্র: উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলার ২১৭৬৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে চারটি নদী অববাহিকা। এগুলিকে যদি আমরা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক অনুসারে দেখি তাহলে পাব মহানন্দা, তিস্তা, জলঢাকা এবং তোর্সা। মহানন্দা ছাড়া বাকি তিনটি নদী ব্রহ্মপুত্র বা যমুনার উপনদী। মহানন্দা হল গঙ্গার উপনদী। ডুয়ার্স আসলে কাঁকর, পলি, বালি সঞ্চিত কয়েকটি ফ্যান বা ত্রিকোণবিশিষ্ট ভূমিভাগ। পার্বত্য প্রবাহ বেয়ে হঠাৎ সমভূমিতে নামলে নদী এই ধরনের ভূমিরূপ তৈরি করে। এই ফ্যানগুলি পরস্পর সংলগ্ন হলেও তিস্তার ফ্যান উপগ্রহ চিত্রে খুব ভাল বোঝা যায়। প্লাইস্টোসিন যুগের শেষে হিমালয় থেকে নেমে আসা বিপুল জলস্রোত প্রচুর পরিমাণে পলি-বালি এনে এই ফ্যান তৈরি করেছিল, যা দক্ষিণে বারেন্দ্রভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রশ্ন: উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে ডুয়ার্সে প্রবাহিত নদীগুলোতে আমরা প্রায়ই বন্যা হতে দেখি, এর কারণ কী?

কল্যাণ রুদ্র: হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ দিকের ঢালে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০০-৩০০০ মিলিমিটারের বেশি। এই বৃষ্টির ৮০-৮৫ শতাংশ ঘটে বর্ষার তিন-চার মাসে। তখন বিপুল জলস্রোত প্রথমে হিমালয়ের ঢাল, পরে ডুয়ার্সের সমভূমি দিয়ে নেমে আসে—বয়ে আনে প্রচুর পরিমাণে কাঁকর, বালি ও পাথর। বন্যা তাই উত্তরবঙ্গের সহজাত সমস্যা। নদীখাত ক্রমশ পলি-বালিতে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে বন্যার সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে। অগভীর হয়ে যাওয়া নদীখাত বর্ষার এত জল ধারণ করতে পারে না। গত শতাব্দীর বৃষ্টিপাতের ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বর্ষার প্রথম পর্বের বৃষ্টি কমছে আর শেষ পর্বের বৃষ্টি বাড়ছে। অল্প পরিসরে অতিবৃষ্টির প্রবণতাও বাড়ছে, ফলে বন্যার সম্ভাবনাও বাড়ছে।

প্রশ্ন: এই সমস্যা কি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই, নাকি এতে মানুষেরও ভূমিকা আছে?

কল্যাণ রুদ্র: মানুষের ভূমিকা তো আছেই। এমনিতে ডুয়ার্সের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোকে যদি আমরা ভালভাবে লক্ষ করি তাহলে দেখব, এরা পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে আসার পর ডুয়ার্সের সমভূমিতে পড়েই অনেকটা চওড়া হয়ে যায়। নদীর বেগ হঠাৎ অনেকটা কমে যায় ঢালের পরিবর্তন হওয়ার ফলে। এর ফলে পার্বত্য অঞ্চলের সংকীর্ণ খাতে প্রবাহিত নদী অনেকটাই চওড়া হয়ে যায় ডুয়ার্সে। এই নদীগুলো আবার বাংলাদেশে ঢোকার পর এদের খাত কিন্তু এতটা চওড়া থাকে না। এরকম অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য খুব কম জায়গার নদীতেই দেখা যায়। মানুষের কার্যকলাপ নদীর এই স্বাভাবিক গতিপ্রবাহকে অনেকটাই বদলে দিচ্ছে। সিকিমে গড়ে ওঠা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো নদীর চলার ছন্দকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আমরা আমাদের সুবিধামতো নদীর জল আটকে রাখছি, আবার প্রয়োজনের তাগিদে অনেক জল একসঙ্গে ছেড়েও দিচ্ছি। গাজলডোবা ব্যারেজে আমি নিজে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছি, সুখা মরশুমে কখনও নদী দিয়ে ৩০০ কিউবিক মিটার জল যাচ্ছে, আবার কখনও মাত্র ৮০ কিউবিক মিটার। নদীর স্বাভাবিক ছন্দ আমরা নষ্ট করে ফেলেছি।

প্রশ্ন: এ ছাড়া মানুষের আর কোন কোন কাজে নদীর ক্ষতি হচ্ছে?

কল্যাণ রুদ্র: এ ছাড়া ভুটানে অপরিকল্পিতভাবে ডলোমাইট উত্তোলন নদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ডুয়ার্সে নদীব্যবস্থার উপর প্রথম ভয়ংকর আঘাত এসেছিল, যখন চা-বাগানগুলো তৈরি হয়েছিল। ওই সময় যথেচ্ছভাবে গাছ কাটা হয়েছিল। পাহাড়ি অঞ্চলে এমনিতেই মাটির গভীরতা কম থাকে। গাছ কাটাতে আলগা মাটি ও বালি-পাথর, যা গাছ ধরে রাখত তা বর্ষার জলের সঙ্গে নদীখাতে এসে পড়ে। ফলে কমে যায় নদীর নাব্যতা। পাশাপাশি বেড়ে যায় বন্যাপ্রবণতা। এই ধরনের ঘটনার উদাহরণ জয়ন্তি নদীতে অস্বাভাবিক পাথর, কাঁকর, বালির সঞ্চয়। নদীখাতে এতটাই পলি সঞ্চয় হয়েছে যে, নদীর উপরের পুরনো ব্রিজটি প্রায় ঢেকে গিয়েছে।

প্রশ্ন: রেল লাইন বা রাস্তাঘাট নির্মাণও তো নদীব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে, তা-ই না?

কল্যাণ রুদ্র: নিশ্চয়, আমরা যদি একটি মানচিত্রে ডুয়ার্সের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখব, এদের বেশির ভাগই উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। আর এখানে রেলপথ তৈরি হয়েছে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর। অর্থাৎ নদীগুলোকে আড়াআড়ি অতিক্রম করার সময় প্রচুর ব্রিজ বানাতে হয়েছে। এই ব্রিজগুলো বানানোর সময় নদী বর্ষায় কতটা চওড়া হতে পারে, সে কথা ভেবে তৈরি করা হয়নি। এখন উপগ্রহ চিত্র দেখলে নদীখাতে রেল ও সড়কপথের প্রভাব বোঝা যায়। ব্রিজের উজান ও ভাটিতে নদী অনেক প্রশস্ত আর ব্রিজের কাছে সংকীর্ণ; দেখলে মনে হয় কেউ যেন নদীর গলাটা চেপে ধরেছে। বর্ষার বিপুল জলস্রোতের তুলনায় ব্রিজের পরিসর এতই সংকীর্ণ যে, ওই পথে অত জল দ্রুত নিকাশের পথ পায় না। ফুলেফেঁপে দু'কূল ভাসিয়ে যায়। যে বন্যার জল আগে দু'-তিন দিনে নেমে যেত, এখন তা আটকে থাকছে আরও বেশি দিন। যেমন ঘটেছিল ১৯৯৬ সালে আলিপুরদুয়ারে। সংকীর্ণ পুরনো ব্রিজটি বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের মতো এখানেও অপরিকল্পিতভাবে জনবসতি বেড়েছে। এখন তো ডুয়ার্সের অনেক জায়গায় নদীর মধ্যেও বসতি হয়ে গিয়েছে। ব্যাহত হয়েছে জলনিকাশের স্বাভাবিক পথ।

প্রশ্ন: অল্প দিনে বেশি বৃষ্টির ফলেও তো সমস্যা দেখা দেয়...

কল্যাণ রুদ্র: দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে এক মাস আগে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। নদীগুলো অনেক আগেই ভরতি হয়ে থাকে। সরু কালভার্ট পার হয়ে জল নিচে নামতে বেশি সময় লাগে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এ ক্ষেত্রে বন্যার সম্ভাবনাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। এই সমস্যার সমাধান করতে নদীর দু'পাড়ে বাঁধ বা এমব্যাঙ্কমেন্ট তৈরি হয়েছে। এতে বন্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অন্য এক সমস্যাও দেখা দিয়েছে। বন্যার সময় যে পলি প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে যেত, এখন তা নদীখাতে জমা হচ্ছে। নদীখাত ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন: ডুয়ার্সে নদীর জলে দূষণের মাত্রা কেমন?

কল্যাণ রুদ্র: চা-বাগান ও কৃষিক্ষেত্রগুলোতে ব্যাপক কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে সেসব কীটনাশক এসে পৌঁছায় নদীগুলোতে। ডলোমাইটের খনিগুলোও জল দূষণ ঘটায়। এর ফলে হারিয়ে যাচ্ছে নদীর মাছ ও নদী সংলগ্ন অংশের ভূ-জীববৈচিত্র। কোথাও কোথাও শহরের কঠিন ও তরল বর্জ্য নদীতে ফেলা হয়। কয়েক বছর আগে দেখেছিলাম, আলিপুরদুয়ার শহরের বর্জ্য কালজানি নদীতে ফেলা হত। এইভাবেই নদী বিষিয়ে যায়। এ ছাড়া কোনও কোনও অংশে নদীর জলে বিষ মিশিয়ে মাছ মেরে ফেলা হয়। ২০১২ সালের গোড়ার দিকে করলা নদীর জলে মিশেছিল এনডোসাফান নামে বিষাক্ত কীটনাশক। আমি ওই সময় নদীটি পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। ভয়ংকর ক্ষতি হয়েছিল ভূ-জীববৈচিত্রের। আসলে আমরা নদীর স্বাভাবিক ছন্দকে নষ্ট করে দেওয়াতেই এমন হচ্ছে। আগে উত্তরবঙ্গে গেলেই খাওয়া যেত সুস্বাদু বোরোলি মাছ, এখন তার প্রায় দেখাই মেলে না।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে ডুয়ার্সের নদীগুলির জলের দূষণ রোধে আপনার ভূমিকা কী?

কল্যাণ রুদ্র: দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাজ হল, কোথায় কতটা দূষণ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা। সঠিক তথ্য তুলে ধরা। আমরা সে কাজ করছি। চা-বাগান বা ডলোমাইট খনি থেকে যে দূষণ ছড়ায় তা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে সামগ্রিকভাবে সরকারের সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের সমন্বয় প্রয়োজন। কথা বলতে হবে ভুটানের সঙ্গে। যত দূর জানি, রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে।

প্রশ্ন: উত্তরবঙ্গের নদীর সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নদীবিজ্ঞানী হিসাবে আপনার অভিমত কী?

কল্যাণ রুদ্র: আসলে আমরা স্থানীয়ভাবে সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দায়িত্ব নিতে হবে সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলিকেও। শিলিগুড়ি শহরে মহানন্দার নদীখাতে খাটাল গড়ে উঠেছে। ওই খাটালগুলির বর্জ্য থেকে মহানন্দা একটা নালায় পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে পুরসভাকেই। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে কীটনাশক প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। নদীর জলে বিষ মিশিয়ে বা নদীর জলের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটিয়ে মাছ ধরা অবশ্যই নিষিদ্ধ করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে সব দায়িত্ব তো প্রশাসনের নয়, নদীর ধারের মানুষকেও সচেতন হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বুঝতে হবে, নদী শুধুমাত্র বহমান জল ও পলির প্রবাহ নয়, ভূ-জীববৈচিত্রও নদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নদী না থাকলে নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গের অস্তিত্ব যে থাকে না— এ কথা সংশয়াতীত। তাই নদীকে বাঁচানো প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।

'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন **জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী**। 'শুধু সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্র নিজেও একজন পরিবেশ কর্মী।

কোনও রাজনৈতিক দলের এতটুকু সদিচ্ছা কোনওদিন ছিল না নদীর গতি প্রতিরোধের বিরুদ্ধে নামার

ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক স্বতঃস্ফূর্ততাকে নগরায়ণের নামে দখল শুরু করল মানুষ। শুধু জঙ্গল কেন, শেষ পর্যন্ত দখল হল নদীর চরও। নদীর দুই ধারেও বসতি শুরু হল, খাটাল বসল। নদী থেকে বালি-পাথর তোলাও চলছে কয়েক বছর যাবৎ। ডুয়ার্সের প্রায় প্রত্যেকটি নদী, জলাশয় আজ দূষণে আক্রান্ত। রাজ্য দূষণ পর্ষদ মহানন্দাকে দূষিত নদী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বহু নদীর চরে মানুষ বসতি স্থাপন করেছে, চাষাবাদ করছে। করলা নদীর মাছ মাঝে মাঝে মরে ভেসে উঠছে।

কিন্তু কেন হল এমনটা? এর জন্য দায়ী কারা? দু'-চার বছর নয়, কয়েক দশক ধরে নিয়মনীতি-শৃঙ্খলাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে এক শ্রেণির মানুষ আর প্রশাসন তাদের প্রশ্রয় দিয়েছে, মদত দিয়েছে। বাধা দেওয়া, নিষেধ করা— এসব কখনও ঘটেনি। কোনও রাজনৈতিক দলের এতটুকু সদিচ্ছা ছিল না এসব প্রতিকারের, প্রতিরোধের। কারণ, গাছপালা, নদনদীদের ভোটাধিকার নেই। তারা মরলে ভোটের রাজনীতিতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু আজ সমগ্র ডুয়ার্স তার অরণ্য-প্রকৃতি-পরিবেশ তথা সমাজ চূড়ান্তভাবেই বিপন্ন।

নদীগুলির নাব্যতা কমেছে, বালি-পাথরে ভরতি হচ্ছে। প্রায়শই পাহাড় থেকে ধস নামে, বালি-পাথরে বোঝাই হয় নদী। নদীর পাড়ে গাছ নেই। ভঙ্গুর মাটির ক্ষয় প্রতিরোধ করে এমন গাছ কাটা পড়েছে। একদিকে চা-বাগানের রাসায়নিক সার-ধোয়া জল, অন্য দিকে খাটালের মলমূত্র, মানুষের ফেলা আবর্জনায় নদীগুলির দূষণ যেমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, অন্য দিকে যত্রতত্র বাধা পেয়ে নদীপথ গিয়েছে ঘুরে। বন্যা ছাড়াও ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় বছরের একটা সময় তীব্র জলসংকট দেখা দেয়।

উন্নয়নের অজুহাতে ডুয়ার্সের বনসম্পদ থেকে শুরু করে নদীপথের উপর যে হারে বিধ্বংসী আক্রমণ চলেছে তা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আটকানো দরকার। শাসকদল থেকে বিরোধী দল কারও এ ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই। সামনে ভয়ংকর বিপদ, সে কথা ভেবে নাগরিক সমাজকে তৎপর হতে হবে। নিজেদের স্বার্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবেই নদীগুলির হারিয়ে যাওয়া রোধ করতে হবে।

অনিমেষ বসু, পরিবেশ কর্মী

মাছ ধরার নামে যথেচ্ছাচার নদীর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে

কোচবিহারের মহারানি ইন্দিরাদেবী যখন কলকাতা বা মুম্বইয়ে থাকতেন, তখন তাঁর জন্য বিমানে বোরোলি মাছ পাঠানো হত রাজপরিবার থেকে। শুধু রাজ-আমল কেন, তিন দশক আগে বাম-আমলেও প্রশাসনিক বড়কর্তারা ডুয়ার্সে থাকলে তাঁদের পছন্দের মেনুতে অবশ্যই ঠাঁই পেত বোরোলি। এ রাজ্যর প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর আপ্তসহায়ক জয়কৃষ্ণ ঘোষকে বোরোলির স্বাদ চেখে দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। জ্যোতিবাবু ডুয়ার্সে এলে তাঁর মধ্যাহ্নভোজের মেনু থেকে কোনওবারই বাদ পড়ত না বোরোলি। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবৎ মৎস্যজীবীদের অভিজ্ঞতা, এখন তিস্তা ও তোর্সায় বোরোলি সারা দিনরাত তন্নতন্ন করে খুঁজলেও মেলা ভার। পাশাপাশি মৎস্যপ্রেমীদের ক্ষোভ, অন্য মাছের কুচো বোরোলি বলে চালানো হচ্ছে। তা ছাড়া বাজারে এখন চালানি মাছের ছড়াছড়ি। ডুয়ার্সের নদীর মাছের স্বাদই আলাদা, এখন কোথায় সেই স্বাদ? দশ-বারো বছর আগেও ৬০-৭০ টাকা কিলো দরে যে বোরোলি মিলত, এখন তার দাম ৩০০-৪০০ টাকা। কিন্তু আগের স্বাদ তাতেও মেলে না।

ইঞ্চি দুয়েক লম্বা। গায়ে এমন দাগ, দেখে মনে হতে পারে যেন শাড়ি পরেছে। চলতি নাম বউমাছ। কিন্তু ডুয়ার্স কিংবা উত্তরবঙ্গের নদী থেকে শেষ কবে ওই মাছ জালে উঠেছিল, মনে করতে পারেন না প্রবীণ মৎস্যজীবীরা। ডুয়ার্সের দোমোহানির অনেক মৎস্যজীবীই এখন বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে জড়িয়ে পড়া মাছ শিকারের জীবিকা ছেড়ে অন্য কাজকারবারে পেট সংস্থান করছেন। যেমন জলপাইগুড়ির রানিরহাটের কিছু মানুষ চার দশক জলঢাকায় মাছ ধরে জীবন চালিয়েছেন। এখন অন্য পথ খুঁজছেন। তাঁদের কথায় জানা যাচ্ছে, বাবার সঙ্গে জাল ফেলতে গিয়ে ভ্যাদা, শীলন, বালুচাটা, বড় চাঁদা, পাবদা, বাতাসি, রিঠা, বাঘারির মতো মাছেদের সঙ্গে আলাপ। তারপর জালে সেসব মাছ কত উঠেছে। কিন্তু বছর সাত-আট সেইসব চেনাজানা মাছ কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছে। শুধু ডুয়ার্স নয়, মালদার পুনর্ভবা থেকে শুরু করে কোচবিহারের তোর্সা, বালুরঘাটের আত্রেয়ী—উত্তরবঙ্গের প্রায় সব নদী থেকেই উধাও হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। বছর পাঁচ-ছয় আগেও গোটা উত্তরবঙ্গের প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরে জীবন নির্বাহ করতেন। নদীগুলি থেকে মাছ হু হু করে কমতে থাকায় তাঁরা পড়েছেন মহা আতান্তরে।

কেন এমনটা হল? নির্বিচারে যথেচ্ছভাবে নদী থেকে মাছ ধরার প্রবণতা আগেও ছিল। মাছের প্রজননের কাল অর্থাৎ বর্ষায় আগেও মাছ ধরা চলত। তার মানে আজকের পরিস্থিতি হঠাৎ নয়, বহুকালের ফসল। তবে আগে ধরা হত প্রাচীন বা প্রথাগত পদ্ধতিতে। ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গে পাহাড়ি নদীগুলিতে মাছ মারার জন্য স্থানীয় মৎস্যজীবীরা অনেকরকম পদ্ধতিতেই মাছ ধরতেন। সাধারণ খেপলা জাল ফেলে মাছ ধরা, ছিপ ফেলে মাছ ধরা, নদীতে জল কমে এলে বড় পাথরের খাঁজে লুকিয়ে থাকা মাছ ঝুপো দিয়ে গেঁথে তুলে আনা ইত্যাদি। কিন্তু ক্রমশই মাছের চাহিদা বাড়তে শুরু করল। পাশাপাশি মানুষের অপরিসীম লোভও। ফলে মাছ ধরার পদ্ধতিতেও ঘটল রদবদল। খেপলা জালের পরিবর্তে মশারির জাল। নদীর জলে বিষ ঢেলে, বিষ তেল ও জলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে মাছ ধরাটাই এক সময় চলে হয়ে গেল। তার বহু আগে থেকেই নদীতে দূষণের মাত্রা বাড়ছিল। এ ছাড়া নদী সংলগ্ন কৃষিজমি ও বেশ কিছু চা-বাগানে ব্যবহৃত রাসায়নিকও এসে মিশতে শুরু করে নদীর জলে। বহুকাল ধরে এসব চলতে থাকায় মাছের বংশবৃদ্ধি যেমন প্রতিহত হয়েছে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

পিছিয়ে যেতে হবে এক শতকেরও বেশি সময় আগে। তখন ডুয়ার্স তথা চা-বাগানের সূত্রেই বাস বহু সাহেবের। তাঁরা অনেকেই ডুয়ার্সের নদী থেকে মাছ ধরতে পছন্দ করতেন। তাঁরাই একটি সংগঠন করে তৎকালীন সরকারকে জানিয়েছিলেন, এই অঞ্চলের মানুষ যথেচ্ছভাবে মাছ শিকার করছে নদী থেকে। ফলে এই অঞ্চলের মাছ কমে আসছে। তাঁদের অভিযোগে সাড়া দিয়ে বন দপ্তর মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু বোঝাই যায়, সেই নিষেধাজ্ঞা কোনও একটা সময় থেকে শিথিল হয়ে যায়। নজরদারির অভাবে হোক কিংবা বন দপ্তরের গা-ছাড়া ভাবেই হোক, সাধারণ মানুষ সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে তোয়াক্কা করেনি। তা না হলে ডুয়ার্সের নদীগুলি থেকে যে ভয়ানক পদ্ধতিতে মাছ ধরা হয় এবং তার ফলে যে বিপুল ক্ষতি ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে তা শুধুমাত্র বিপজ্জনক বা ভয়ংকর বললে কিছুই বলা হয় না।

নদীর জলে ডিনামাইট ফাটিয়ে, বিষ ঢেলে অথবা ইলেকট্রিক শক দিয়ে যে হারে মাছ ধরা চলছে, তাতে ডুয়ার্সের নদীগুলির মাছ কেবল শেষ হয়ে যাচ্ছে না, নদীর যাবতীয় জীববৈচিত্র বিপন্ন হয়ে পড়ছে। উদ্‌বেগ এখানেই শেষ হয় না। নদীতে মাছের ডিম ফোটার সময় বা চারামাছ বড় হওয়ার সময়কালে ডুয়ার্সের নদীগুলিতে ওই বিপজ্জনক পদ্ধতির মাছ শিকারের কারণে মাছের বংশবৃদ্ধি হওয়ার

গোটা প্রক্রিয়াটাই সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইসব অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রক্রিয়ায় মাছ ধরায় নদী তথা নদীর জীববৈচিত্রে যে কী বিপুল পরিমাণ ক্ষতিসাধন ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে তা অনুমান করাও কঠিন। অথচ বাজারে মাছের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এবং জোগান দিয়ে ভালরকম দাম পাওয়ায় জলের মধ্যে বড় কোনও পাথরে প্রচণ্ড জোরে বিশাল হাতুড়ির আঘাত সৃষ্টি করে একসঙ্গে অনেক মাছকে আধমরা করে ধরে নেওয়া, জলে কঠিন বিষ ঢেলে অনেকটা বড় এলাকার বহু মাছ মেরে জলে ভাসিয়ে তুলে ফেলা কিংবা ইলেকট্রিক শক দিয়ে জল থেকে মাছ তুলে আনা শুধু মাছের বংশনাশই করছে না, জীববৈচিত্রে নিদারুণ আঘাতও হানছে। কিন্তু সব জেনে-বুঝেও প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিল? বন দপ্তর দু'-চার দিন বনবস্তি বা নদীর পাড় সংলগ্ন গ্রামগুলিতে সচেতনতা কর্মসূচি চালাল। কিন্তু তাতে ফল কী হল?

ইলেকট্রিক শক দিয়ে নদী থেকে মাছ ধরা গত দশ বছর যাবৎ বেশ ভালই চলছে। একটি ছোট জেনারেটর বা বারো ভোল্টের ব্যাটারি, দু'টি তার, সাইকেলের স্পোক বা ওই জাতীয় লোহার শিক দিয়ে সকালবেলায় চার-পাঁচজনের একটি দল বেরিয়ে পড়ে। তারা আলিপুরদুয়ারের কাছে বক্সা জঙ্গল কিংবা যে কোনও অঞ্চলের নদীর ধারে ছোট জেনারেটর কিংবা বারো ভোল্টের ব্যাটারিটি বসায়। ব্যাটারি বা জেনারেটর থেকে বেরনো তার দু'টিতে সাইকেলের স্পোক অথবা লোহার পিক জুড়ে দেয়। নদীর স্রোত যখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তখন নদীর গভীর জায়গাগুলিতে তৈরি হয় একেকটি ছোট জলাধার। ওই জমা জলই তখন হয় মাছেদের আশ্রয়স্থল। প্রায় শুকিয়ে আসা পাহাড়ি নদীতে ওই সময় প্রায় সব মাছ এবং প্রাণবৈচিত্র বেঁচে থাকার জন্য ওই জলেই আশ্রয় নেয়। এদিক থেকে মাছ শিকারের জন্য ওই সময়টাই আদর্শ। জাল ফেলে কিংবা ছিপের সাহায্যে ওই সময় ওই জলাধার থেকে মাছ মারা খুব কঠিন কাজ নয়, কিন্তু অনেক সময় ব্যয় করলে তবেই অনেক মাছ ধরা যেতে পারে। কিন্তু তখন ওই জলে ইলেকট্রিক শক ব্যবহার করলে আর সময় নষ্টর কোনও প্রশ্ন নেই, একবারেই প্রায় সমস্ত মাছকে শেষ করে ফেলা যায়। সেই সঙ্গে ওই জলের সমগ্র প্রাণীবৈচিত্রও নিধন হয়ে যায়। ডুয়ার্সের প্রায় সব নদীর উজানেই এমন ঘটনা ঘটে চলেছে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে।

নদীর জলাধারে আশ্রয় নেওয়া মাছগুলিকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে সহজেই ধরার যে পদ্ধতি, সে তো চলছেই। এ ছাড়া ক্ষীণ জলধারার মুখে মাটি আর লতাপাতা দিয়ে এক অস্থায়ী বাঁধ তৈরি করে স্রোত আটকানো হয়। এ ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় পুরনো ব্যাটারি। যেসব গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, এমন গ্রাম তো ডুয়ার্স এলাকায় এখনও আছে। সেসব গ্রামে ১২ ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে টিভি চালানো হয়। কেউ ঘরে ছোট আলোও জ্বালান। ডুয়ার্স এলাকার বিভিন্ন বাজারে ওই ব্যাটারির দাম পড়ে আড়াই-তিন হাজার টাকা। পুরনো ব্যাটারি বিক্রি হয় ৮০০-৯০০ টাকায়। মাছ ধরার ক্ষেত্রে

চার-চারখানা জাল আমার, এখন এমনিই পড়ে থাকে

আমার বাবা মাছ ধরত। দাদাও ধরত। বাবা মাছ ধরা শিখেছিল দাদার কাছ থেকে। আমি বাবার কাছে। এই রামশাই, আমগুড়ি এলাকায় এক সময় অনেক মুসলমান ছিল। আসার সময় চায়ের ফ্যাক্টরি দেখলেন তো? ওইখানে হাতিওয়ালা বাড়ি ছিল। এইরকম আরও অনেক পয়সাওয়ালা মুসলমান বাংলাদেশ চলে গিয়েছে। মাঝারিরাও গিয়েছে। আমরা যাইনি। এই জলঢাকার পাশেই আমাদের ঘর। অন্যখানেও জমি আছে। তবে আমার ছেলেরা, নাতিরা কেউ মাছ ধরার কাজ নেয়নি। এক জামাই আছে কোচবিহারের গোঁসাই হাটে। সে মাছের ব্যবসা করে। আল্লা যদ্দিন রাখবে আমাকে, আমি মাছই ধরব।

আমি ছোট থেকেই দাদা আর বাবার সঙ্গে নৌকায় ঘুরতাম এই জলঢাকা নদীতে। সামনের ওই চরটা ছিল না তখন। আমরা খানিকটা উজানে, ফরেস্টের কাছে গিয়ে মাছ ধরতাম। কেউ বাধা দিত না। এখন অনেক 'প্যাখনা' হয়েছে। জলঢাকা হল মাছের রাজত্ব। এই নদীর শোল মাছ দেখছেন? দেখেননি। পাওয়াই যায় না এখন। সেই মাছ আমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। তারপর কোঁচা মারতাম টিপ করে। আমার ভাল টিপ ছিল। দাদার টিপ অবশ্য আল্লার দেওয়া। অন্ধকারে একটা কুপি হাতে কোঁচা ছুড়ে মাছ তুলত দাদা।

জলঢাকার বোরোলি এখনও আছে। সকাল সকাল আসবেন। আটটার মধ্যে। টাটকা বোরোলি দেব আপনাকে। ট্যাংরা, চাপলা, ফলি— এসব দু'-চারটে এখনও পাই। ধরুন হাফ কিলো ট্যাংরা আর এই দেড় পোয়া চাপলা। তবে দাম ভাল পাই। শোল একখানা ক'দিন আগেই পেলাম। দু'শো টাকায় কিনে নিল। এর বাইরেও পুঁটি পাই। তেতো পুঁটি না। একটু বড় মিঠা পুঁটি। চ্যাং মাগুর টাকি... এসব তো আগে জল-কাদায় এমনিই পাওয়া যেত। এখন অত জায়গা নেই। খেত হল। চায়ের বাগান হল। কীটনাশক মেশায় তো। ফলে মাছ হয় না আর।

ভুটানের পাহাড়ে ডলোমাইট তোলার জন্য লাঠির মতো বোমা ফাটায় জানেন তো? ওই লাঠিতে আগুন দিয়ে জলে ফেলে দিত লোকজন। বাইরে থেকে আসা। দড়াম করে আওয়াজ হত। মাছ মরে ভেসে উঠত জলে। এখন আর লাঠি ফাটায় না। জলে বিষ ঢেলে দেয়। সব বাইরে থেকে আসা লোক। আমরা এসব করি না। কিন্তু আমরা না করলেও জলঢাকার উপরের দিকে অনেকে বিষ দিয়ে মাছ ধরে। মাছ তাই কমে যাচ্ছে। এখন এক কেজি বোরোলি পেলেই যথেষ্ট। আমরা কয়েক ঘর এখনও যে মাছ ধরছি, আমরাই শেষ মাছুয়া। আগে ময়নাগুড়ি থেকে লোকে সাইকেল নিয়ে, ছিপ নিয়ে আসত। এখন আসে না। এখন টুরিস্ট আসে। লোকাল পাবলিকের সময় নেই। ছেলেছোকরারা তো মাছ ধরার বিদ্যাই জানে না। ওদের বাপেরা কেউ কেউ ধরে।

আগে অনেক ধরনের মাছ ধরতাম। তখন দাম কম ছিল। সব মাছ বিক্রি হত না। নিজেরা খেতাম। এখন মাছ ধরার আগেই কাস্টমার বুক করে রাখে। দেশি লোকেরা আগে মাছ কম কিনত। পুকুর-ডোবা তো সবার ঘরেই ছিল। জলের সময় কত মাছ খেতেই ঘুরে বেড়াত। বাঁশের তৈরি অনেকরকম মাছের 'ফান্দ' ছিল। এখন কিছুই নেই। এখন দেশি লোকেরা মাছ কেনে। তবে বরফ দেওয়া চালানি মাছ বেশি নেয়। আমাদের মাছের দাম আছে না! তখন চালানি মাছ ছিল না। শরীরে আগের মতো জুত নেই। থাকলে বেচে রোজ হাজার টাকা কামাতাম।

না। জলঢাকা আর আগের মতো নেই। কোনও কিছুই আগের মতো নেই। তবে মাছ তো খেতেই হবে। ইচ্ছা ছিল একটা পুকুর করে মাছের চাষ করব। এখন আর হবে না। আপনি করলে আমি আছি, তবে কি জানেন — বাইরে থেকে এসে আপনি পুকুর টেকাতে পারবেন না। বললাম না, আগের মতো আর কিছু নেই। আমার দুটো নৌকা আর চারখানা বড় জাল আছে। সব ক'টা জাল আর পাততে পারি না এখন।

কলিমুদ্দিন চৌধুরী, পানবাড়ির মৎস্যজীবী

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় পুরনো ব্যাটারি। ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন বক্সা জঙ্গলের ডিমা আর সরম নদীতে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মাছ ধরার খুব চল। ব্যাটারিটি রাখা হয় অস্থায়ী বাঁধের উপর। ব্যাটারির নেগেটিভ-পজিটিভ প্লাগের সঙ্গে লাগানো ক্রোকোডাইল ক্লিপ থেকে বার হওয়া দু'টি তারের মাথায় লাগানো হয় দু'টি সাইকেলের স্পোক অথবা লোহার শিক। মাছকে লক্ষ্য করে সেই স্পোক বা শিক মাছের গায়ে লাগানোমাত্রই তার আয়ু শেষ হয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে মাছ ধরা চলছে আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের শালকুমারহাট সংলগ্ন শিলতোর্সা, সানজাই নদীতেও। অনেক ক্ষেত্রে নদীর কাছাকাছি ইলেকট্রিক পোস্ট থেকে হুকিং করেও কেউ কেউ বিদ্যুৎ চুরি করে। সে ক্ষেত্রে তারের সঙ্গে আটকানো স্পোক বা শিক ধরার জন্য কাঠের হাতল লাগিয়ে নেয়। কিন্তু ওই পদ্ধতি দু'দিক থেকেই বিপজ্জনক। এক, শক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি মাছ যেমন মারা পড়ে, তেমনি ওই জলে থাকা সাপ, ব্যাং এবং অন্যান্য ছোটখাটো প্রাণীও মরে যায়। দুই, এমনও অনেক সময় হয়েছে, মাছ শিকারি অসাবধানতাবশত জলে নেমে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। হুকিং করা বিদ্যুৎ থেকে মাছ ধরার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম হলেও ব্যাটারিচালিত বিদ্যুতের শক দিয়ে মাছ মারা কিন্তু প্রতিরোধ করা যায়নি। যেমন মারাত্মক বিষ থাইডেনের ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার পরও নদীতে বিষ দিয়ে মাছ মারার ঘটনা প্রায়শই ঘটে ডুয়ার্সে। থাইডেন ব্যাপকভাবে ব্যবহার হত চা-গাছের পোকা মারার জন্য। ওই বিষ চোরাপথে বাইরে এনে নদীতে মাছ মারার কাজে ব্যবহার হত। সেই মাছ বাজারে বিক্রিও হত। ধরে নেওয়া যায়, সেই প্রবণতা এখন অনেকটাই কমেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ডুয়ার্সের বহু নদীর বিভিন্ন প্রজাতির মাছ প্রায় বিলুপ্ত। পাশাপাশি জলজ প্রাণবৈচিত্র প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রিক শক দিয়ে মাছ শিকার কিংবা অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরা বন্ধ হয়নি। স্থানীয় থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বস্তরেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাঁরা যে কখনওই নড়াচড়া করেননি বা কোনও পদক্ষেপই করেননি, সে কথা বলা যাবে না। কিন্তু পদক্ষেপে কোনও ধারাবাহিকতা নেই। বলা যায় গা-ছাড়া ভাব। সচেতনতা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও নেই লাগাতার কোনও প্রক্রিয়া। ফলে অবৈধ মাছ শিকারে ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের নদীর প্রাণবৈচিত্র যেভাবে ধ্বংস হয়েছে তা ত্বরান্বিত হয়ে চলেছে দ্রুতলয়ে। জানতে ইচ্ছে হয়, ডুয়ার্স আর কতটা মরণাপন্ন হলে প্রশাসনের ঘুম ভাঙবে? আর কত ক্ষতি-মৃত্যু-ধ্বংস ঘটলে প্রশাসকরা নড়েচড়ে উঠবেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন

শহরের আবর্জনায় থমকে গিয়েছে পাগলাঝোরা

ডুয়ার্সের মালবাজার মহকুমার উত্তর প্রান্তের গুরজংঝোরা আর রাজা চা-বাগান হয়ে একদিন সেই তরঙ্গিণী মালবাজার শহরে ঢুকে পড়েছিল। কবেকার সেই কথা, তার কি দিনক্ষণ কিছু মনে করা যায়? তবে এ অঞ্চলের প্রবীণ মানুষ মাত্রই জানেন তার কথা। তার চলার পথ ছিল ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভিতর দিয়ে। তারপর সে আপন ছন্দেই পেরিয়ে যেত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক। ওই সড়ক টপকেই সে ঢুকে পড়েছিল ৪, ৫, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। এক সময় এইসব ওয়ার্ডের ভিতর দিয়ে বয়ে চলাই ছিল তার গতিপথ। এখন সবই অতীত। বর্তমান শুধুমাত্র তার বয়ে চলার চিহ্ন। অস্তিত্ব পুরোপুরি লোপাট। আজ সেই পাগলাঝোরা শুধুই ইতিহাস। অথচ একদিন তার স্রোত ছিল। কুলকুল করেই সে বয়ে যেত। পাগলাঝোরার কথা কিন্তু মালবাজারবাসীদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়নি। সে দিন তার স্রোত ছিল। ঝোরার কাছাকাছি পৌঁছালে জল-পাথর ঠোকাঠুকির শব্দও শোনা যেত। পাথরগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে গিয়েছে। জলেরও আর দেখা মেলে না। বর্ষায় হয়ত কোনও কোনও বছর প্রবল বৃষ্টিতে তার পড়ে থাকা চিহ্ন দিয়ে আচমকা কিছুটা জল বয়ে যায়। বৃষ্টির দিন ফুরালে আর তাকে দেখা যায় না। পাগলাঝোরার স্মৃতির বুকে জমে থাকে শহরের জঞ্জাল, প্লাস্টিক, থার্মোকল ভরা আবর্জনা। স্রোতের কুলকুল শব্দের বদলে এখন দুর্গন্ধ ছড়ায় চারপাশে।

কেন হল এমনটা? তরঙ্গিণীর বুক এমনভাবে আবর্জনার স্তূপে পরিণত হল কীভাবে? দু'-চার বছরে যে এমন পরিস্থিতি হতে পারে না, সে তো বলাই বাহুল্য। তবে খুব একটা অনুসন্ধানের দরকার পড়ে না। সাধারণ দৃষ্টি থেকে নজর এড়ায় না— মালবাজার পুরসভার অন্ততপক্ষে কুড়িটি। খতিয়ে দেখলে হয়ত সংখ্যাটা বাড়বে। ছোট-বড়-মাঝারি নিকাশির মুখগুলি রয়েছে পাগলাঝোরার পথে। দীর্ঘকাল ধরে ওইসব নিকাশি বেয়ে পুর এলাকার বর্জ্য অনবরত এসে পড়েছে পাগলাঝোরায়। এর সঙ্গে প্লাস্টিক, থার্মোকলসহ শহরের যাবতীয় আবর্জনাকে ধারণ করতে করতেই বিলুপ্ত হয়ে গেল পাগলাঝোরা। মালবাজার শহরের বাসিন্দারা কিন্তু পাগলাঝোরাকে দূষণমুক্ত করে তার অতীত চেহারায় ফিরে পেতে চায়। তাই তাঁরা পাগলাঝোরার আজকের অবস্থার জন্য যেমন পুরসভার অবহেলা এবং উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন, তেমনি দূষণমুক্ত পাগলাঝোরাকে ফিরে পাওয়ার দাবিও জানিয়েছেন। আশার কথা, মালবাজার পুরসভার বর্তমান পুরবোর্ড পাগলাঝোরা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন।

পুরবোর্ডের বক্তব্য, শহরের উত্তর দিকে এখন অনেক চা-বাগান রয়েছে, যার মধ্যে দিয়েই ছিল পাগলাঝোরার চলার পথ। চা-বাগানগুলির নিয়ন্ত্রণহীন সেচব্যবস্থার জন্য পাগলাঝোরার জল আটকানো হত। এর ফলে বাধাপ্রাপ্ত পাগলাঝোরা তার চলার পথ ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হত। বেশ কয়েক বছর যাবৎ মালবাজার শহরে গরমের দিনগুলিতে, এমনকি শীতের সময় অর্থাৎ শুকনো মরশুমে চরম জলকষ্টের মুখোমুখি হয়। এই সমস্যা দূর করতে এবং পাগলাঝোরাকে দূষণমুক্ত করে তার পুরনো দিন ফিরিয়ে আনতে পুরবোর্ড শীঘ্রই সুচিন্তিত পরিকল্পনার পদক্ষেপ করবে বলে সূত্রে খবর। তবে পাগলাঝোরা পুরনো ছন্দে কবে চলতে শুরু করবে, সেটা এখন সময়ের অপেক্ষা।

নিজস্ব প্রতিবেদন

এ নদী কেমন নদী!

জলপাইগুড়ি শহরের মাঝ দিয়ে চলেছে করলা নদী। এ নদী প্রকৃতই অপরূপা। এক সময় সারাটা বছর জল থাকত নদীতে। নদীর পাড়ে সারা বছর আনাগোনা ছিল দু'-চারজন মৎস্য শিকারির। এখন গ্রীষ্মে নদীতে থাকে সামান্য জল।

নদীর উপর ছিল চারটি সেতু। কিং সাহেবের ঘাটে পথচারীদের সেতু ও সদর বালিকা বিদ্যালয়ের বিপরীতে 'ঝোলনা' সেতু দু'টির গঠনশৈলী ছিল অপূর্ব। কিং সাহেব ঘাটের ওই পায়ে চলা সেতু চিরতরে হারিয়ে গেছে ১৯৬৮-র বন্যায়। ঝোলনা ব্রিজ ছট পুজোর ভিড়ে ভেঙে যায়। পরে সাদামাটা একটা সেতু তৈরি হয়।

নদীর পাড়ে বাঁধ, চুপিচুপি প্রেমের জায়গা। পাড়ার মেয়েকে বেপাড়ার কোনও ছেলে প্রেম নিবেদনের জন্য ঘোরাঘুরি করলে স্বঘোষিত পাড়ার যুবদল মার দিতে দ্বিধা করত না। সেখানে করলা নদীর বাঁধ ছিল কিছুটা নিরাপদ। কিছু বখাটে ছেলে ওদের প্রেমপর্বে মাঝেমধ্যে বিরক্তও করত।

নদীটি মৎস্যজীবীদের জীবিকার ব্যবস্থা করত। তা ছাড়া নদী তার চলার পথে কৃষিজমিতে সেচের কাজে লাগত। অনেক শহরপ্রেমী পুরনো মানুষ করলাকে লন্ডনের টেমস নদীর সঙ্গে তুলনা করত। টেমস নদীর পাড়ে বেশ কয়েকদিন দাঁড়িয়ে আমি নদীকেন্দ্রিক কর্মতৎপরতা দেখেছি, মনে হয়নি তুলনা সার্থক। টেমস লন্ডনের লাইফলাইন। এই নদীপথ যাত্রীবাহী ফেরি ও মালবাহী জলযানে সদাব্যস্ত।

করলা ছিল শান্ত-সমাহিত। এই শহর ও সংলগ্ন গ্রাম বা চা-বাগানের গা ঘেঁষে নিরুদ্‌বিগ্ন তার পথ-চলা। এই নদীর পাড়ে ছট পুজোর আয়োজন, পিতৃতর্পণ ও অন্যান্য লোকাচার সারা বছর নানা সময়ে অনুষ্ঠিত হত।

তবে এ নদীর তীরে দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। এখানে এখনও একদিনেই শহরের প্রায় সব প্রতিমা বিসর্জন হয়। আটের দশকেও নদীর এমন রুগ্‌ণ রূপ ছিল না। তা ছাড়া নদীর জল তখনও দূষিত হয়ে যায়নি। সে সময় পাড়ার পুজো কমিটির তরুণরা বিসর্জনের দিন সকালে নদীর পাড়ে জায়গা চিহ্নিত করে যেত। সন্ধ্যার সময় প্রতিমা ট্রাকে বা ঠেলাগাড়ি চাপিয়ে থানার পিছনে নদীর পাড়ে আনা হত। সিদ্ধি বা ভাঙের শরবত চালু ছিল। ঢাকের আওয়াজে কানে প্রায় তালা লাগে আর কী। এত জোরালো আলো ছিল না। তবে পুরসভা আলোর ব্যবস্থা করত। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে ঢাকের তালে নাচ চলত। কিছু পাড়ার পুজোয় বা বাড়ির পুজোয় মেয়েদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সুবেশীদের উপস্থিতি নাচের তেজ বাড়িয়ে দিত। মেয়েদের কিন্তু নদীর ঘাটে নাচতে দেখা যেত না। কিন্তু প্রতিমা নৌকাতে চাপিয়ে নদীর ধার ঘেঁষে ঘোরানো হত।

প্রতিমা ছাড়াই বেলুনে নৌকা সাজিয়ে নদীর বুকে ভেসে বেড়ানো খুব চালু ছিল। অবশ্যই তারস্বরে মাইক বাজত। তারপর ঠাকুরকে সাত পাক ঘুরিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া। বিষাদঘন মুহূর্ত। নদীতে যারা নামত, তাঁরা জল ছেটাত। ওটা শান্তির জল।

এবার দল বেঁধে পাড়ায় ফিরে আসা। রাস্তার ধারে জিলিপি, বোঁদে, মিহিদানা খুব বিক্রি হত। সবাই ফিরে এসে পাড়ার প্যান্ডেলে মিষ্টিমুখ করে প্রণাম ও কোলাকুলি পর্ব শুরু হত। পাড়ার যে কোনও বাড়িতে বিজয়ার প্রণাম করতে গিয়ে মিষ্টিমুখ করা যেত।

কিছু বাড়িতে যাওয়ার জন্য বিশেষ তাগিদ থাকত সুন্দরীদের দূর থেকে দেখার আশায়।

এখন করলা অসুস্থ, কলুষিত। অল্প যে জল থাকে শরৎকালে, তাও স্থবির। ধীরে ধীরে করলার মৃত্যু এগিয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছে বিসর্জনের জৌলুস। করলার পাড় সংকীর্ণ হয়েছে। তা ছাড়া এখন বিসর্জনের ঘাট অনেকগুলো। কাজেই বিসর্জনের দিন সারা শহরকে আর একসঙ্গে পাওয়া যায় না। এই নদীকে প্রাণদানের নাকি নানা চেষ্টা চলছে। তবে নদীটি এখনও প্রাণ ফিরে পায়নি।

বিষ ঢেলে নদীর সব মাছ মেরে ফেলেছে দুষ্কৃতীরা। নদী স্রোতহারা। প্রতিদিন এখানে ফেলা হয় শহরের বড় (স্থানীয় নাম দিন বাজার) বাজারের বর্জ্য। কাজেই ওই দুষ্টুমিষ্টি নদীর দম বন্ধ হয়ে আসছে।

নদীর উপর নতুন ব্রিজ তৈরি হয়েছে। খেলাধুলোর উন্নয়নে 'বিশ্ব বাংলা স্টেডিয়াম'। তার পিছনে করলা নদীর পাড় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ভ্রমণকারীদের জন্য বাঁধানো পথ, পাশে বসার জায়গা। এ বছর ভ্যালেন্টাইন'স ডে-র দিন সন্ধ্যাবেলায় যুবক-যুবতীদের দেখে আশা জাগছে, করলা তার পুরনো রূপ হয়ত ফিরে পাবে।

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা

এখন ডুয়ার্স-এর উদ্যোগে এরকমই একটি অভূতপূর্ব সংকলন প্রকাশিত হবে আগামী জুন মাসে। এই অঞ্চলের খ্যাত-অখ্যাত কবিদের নিজস্ব বাছাই কবিতাগুচ্ছ থাকছে এই সংকলনে। স্বভাবতই কলেবরে আয়তনে দশাসই হবে বলাই বাহুল্য। ডুয়ার্সের যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের সবার কাছে আহ্বান রইল এই সংকলনে কবিতা সহ যোগ দেওয়ার। কবিতায় ডুয়ার্স ভূখণ্ডের উপস্থিতি কাম্য। প্রত্যেকে তাঁর সেরা কুড়িটি কবিতা (প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত) বাছাই করে টাইপ করে পিডিএফ ফরম্যাটে মেল করুন ekhonduars.sahitya@gmail.com কিংবা হাতে বা ডাকযোগে হলে পাঠান 'এখন ডুয়ার্স'-এর ডুয়ার্স ব্যুরো অফিসে। (মুক্তাভবন। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি) আরও কিছু জানতে চাইলে ফোন করুন অমিতকে (৯৬৪৭৭৮০৭৯২) বা শুভ্রকে (৯৪৭৫৫০৩৩৪৮)। কবিতা পাঠাবার শেষ তারিখ এপ্রিল ৩০, ২০১৬।

দেবপ্রসাদ রায়

গত শতাব্দির ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়টা এ রাজ্যের রাজনীতিতে নানা দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য সময়। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব আচ্ছন্ন করেছিল ডুয়ার্সকেও। জলপাইগুড়ি জেলায় গান্ধিজির শতবর্ষ উদ্‌যাপন থেকে শুরু করে এমন বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা লেখক শুধু প্রত্যক্ষই করেননি, তার অংশীদারও ছিলেন। সরাসরি সেই সব ঘটনার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ না করে প্রবহমানতাকে একান্ত ব্যক্তিগত কথনে উপস্থাপিত করেছেন। যেখান থেকে পাঠক ছুঁতে পারেন তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি ও সময়কে। পাশাপাশি ওই সময়ের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বদের চিনতে পারেন সময়ের ক্যানভাসে। এভাবেই এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জীবনধারাভাষ্য ক্রমশই হয়ে ওঠে উৎসাহব্যঞ্জক এবং সুপাঠ্য।

৬

১৯৬৭ থেকে ’৬৯— এই সময়কালে যখন রাজনৈতিক পরিবেশ নানা ঘটনার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, তারই মধ্যে প্রিয়দার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। তিনি জলপাইগুড়িতে এসেছেন। রাজ্য ছাত্র পরিষদের সভাপতি হয়েছেন ’৬৭-তেই, শ্যামল ভট্টাচার্যর পরিবর্তে। রায়গঞ্জের ছেলে হওয়ায় উত্তরবঙ্গ থেকে আমরা তাঁকেই সমর্থন জানিয়েছিলাম। তখন এ রাজ্যে কংগ্রেসকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে মূলত ছাত্র পরিষদ। কংগ্রেসের পতাকার তলে যা কিছু ক্রিয়াকর্ম, তার সিংহভাগই ছাত্র পরিষদের সৌজন্যে। পরে শ্যামল চক্রবর্তী একটা বই লিখেছিলেন, যার নাম ‘ছাত্র পরিষদ কীর্তি ও কেলেঙ্কারি’। ছেপেছিল আনন্দ পাবলিশার্স। সে বই অবশ্য এখন দুষ্প্রাপ্য। ওটা পাওয়া গেলে আরও অনেক কিছু জানা যাবে তৎকালীন ছাত্র পরিষদের ভূমিকা বিষয়ে।

১৯৬৯-এর জলপাইগুড়িতে গান্ধিজির শতবর্ষও পালিত হয়েছিল বেশ বড় করে। সেটা হয়েছিল বর্তমান কমার্স কলেজে। এতে যে আমি ভালমতোই জড়িয়েছিলাম তা না বললেও চলে।

এইসব রোমাঞ্চকর দিনে আমার কাছে একদিন অন্তিদা মারফত একটা খবর এল। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে ভারত সেবক সংঘের তত্ত্বাবধানে একটা বড়সড়ো ত্রাণের কাজ হচ্ছে এবং সেখানে একটা অস্থায়ী পদও খালি আছে। অন্তিদা জানতে চেয়েছিলেন, আমি সে পদে যোগ দিতে রাজি কি না। প্রস্তাবটা পেয়ে কিছুদিন আমি ‘নেব কি নেব না’ করে কাটাচ্ছিলাম। কংগ্রেসের অফিস তখন পান্ডাপাড়ায়, কংগ্রেস ভবনে। জেলা সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ শিকদার। অন্য দিকে, প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা খগেন দাশগুপ্ত। জলপাইগুড়ি কংগ্রেসের তখন এই দুটো শিবির। শহরের চা শিল্পপতিদের সমর্থনটা ছিল খগেনবাবুর দিকে। অন্য দিকে, রবিবাবু ছিলেন অতুল্য ঘোষের স্নেহধন্য এবং সংগঠনটাও ছিল তাঁর সঙ্গে। উপরন্তু উনি প্রাথমিক শিক্ষক বোর্ডেরও সভাপতি ছিলেন বলে প্রচুর প্রাইমারি টিচার নিয়োগ করতে পেরেছিলেন। ফলে খগেনবাবু তাঁর প্রতিপত্তি সত্ত্বেও রবিবাবুর সাংগঠনিক ব্যাপারটাকে ভাঙতে পারতেন না। এক কথায়, দু’জনেই ছিলেন জেলা কংগ্রেসে সমান প্রভাবশালী।

এই অবস্থায় আমার মতো যাঁরা নতুন, তাঁরা একটু সমস্যায় থাকতেন যে কোন গোষ্ঠীর দিকে তাঁকে ঝুঁকতে হবে! আমিও তাই দোটানায় ছিলাম। জেলা পরিষদে ত্রাণ কমিটির চাকরির প্রস্তাব পাওয়ার কিছুদিন পর আমাকে জানানো হল যে, রানিনগরে রবিবাবুর পরিচালনায় একটা স্কুল আছে। সেখানে একটা ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সি আছে। চাইলে আমি সেখানে যোগ দিতে পারি। বেতন ১৫৮ টাকা।

আমি সেই চাকরিটাতেই যোগ দিলাম। এটা ’৬৯-এর একেবারে গোড়ার কথা। আগেই বলেছি যে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি. অতুলবাবুর সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। অন্তিদা একদিন আমাকে ডেকে একটা বিচিত্র দায়িত্ব দিলেন। পুরনো প্রথায় যে বি.এ. পরীক্ষা নেওয়া হত তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এক্সটার্নাল পরীক্ষার্থীদের জন্য তিন বছর অতিরিক্ত সময় দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়। সে সময় শেষ কিন্তু আরও ছ’জন পরীক্ষার্থী অতিরিক্ত আরেকটি বছর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে ইচ্ছুক ভি.সি.-র কাছে। অন্তিদা অতুলবাবুর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাকে দায়িত্ব দিলেন। সেই ছ’জনের মধ্যে তলাপাত্র বাড়ির কুমকুম তলাপাত্র, নয়াবস্তির দিকে প্রতিমাদি বলে একজন, রায়কতপাড়ার রথীশ সরকার— যাঁকে বলতাম বাচ্চুদা। তিনি পরে আনন্দমার্গী হয়ে যান।

অন্তিদা জানতেন কাকে দিয়ে কী কাজ করাতে হয়। এটাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। ‘নকশাল সমস্যা? ওটা বাবলু সামলায়। বাবলুর কাছে যাও, আমি লিখে দিচ্ছি। থানা-পুলিশ? আচ্ছা! ওটা তো রাতুল সামলায়। রাতুলের কাছে যাও, আমি লিখে দিচ্ছি।’ পরীক্ষার্থীদের সমস্যাটা জেনেই তিনি আমার কথা ভেবে ফেলেছিলেন এই কারণে যে, আমার প্রতি অতুলবাবুর স্নেহের ব্যাপারটা তাঁর জানা ছিল।

কিন্তু অতুলচন্দ্র রায় ছিলেন সিংহপুরুষ। উনি কারও কাছে মাথা নত করেনি। আমি যাওয়ামাত্রই এক বছর বাড়ানোর দাবি ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন, ‘বোসো। কথা আছে।’

বসলাম। তিনি হাতের কাজটা শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী করছ?’

'৬৭-র নির্বাচনে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল, সেটা ন'মাস ক্ষমতায় থাকার পর আশু ঘোষের চালে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। আমরা সেই 'ন'মাস' উক্ত সরকারের কাজকর্মের উপর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম '৬৯-এ।

'জুনিয়র হাই স্কুলে পড়াচ্ছি।'

'মাইনে কত পাও?'

'একশো আটান্ন টাকা।'

'একশো আটান্ন টাকায় জীবন চলবে?'

আমি তখন জানালাম যে, ইউনিভার্সিটিতে রেখে পড়ানোর মতো আর্থিক ক্ষমতা আমার বাড়ির নেই। বস্তুত আমি একবার ভরতিও হয়েছিলাম, কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। ইউনিভার্সিটি যাওয়ার বদলে জুনিয়র হাই স্কুলে পড়াচ্ছিলাম। আমার উত্তর শুনে অতুলবাবু বললেন, 'শোনো! জলপাইগুড়ির ছাত্রদের টিউশন ফি লাগছে না। ফ্লাড এফেক্টেড এরিয়া বলে মকুব করা হয়েছে। তুমি স্টাফ কোয়ার্টারে থাকবে, আমি ঘর দিয়ে দেব। ক্যান্টিনে খাবে, আমি বিল দিয়ে দেব। আর লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়বে। তুমি পড়ো!'

সুযোগ পেয়ে ভাবলাম, দেখাই যাক। ফলে ফিফ্থ ইয়ারে ক্লাস করতে লাগলাম। তখনকার অধ্যাপকদের মধ্যে শংকর গুপ্ত, শ্যামল রায়— এঁদের কথা মনে আছে।

কিন্তু এসব ঘটেছে '৬৯-এর নির্বাচনের আগে। নির্বাচনের ঘণ্টা পড়তেই খগেনবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখনও অবধি আমাকে ভাল করে চিনতেনই না। তিনি ডেকে বললেন, 'আমি নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছি, আর তুমি ইউনিভার্সিটিতে বসে আছ? চলে এসো! ছুটির ব্যাপারটা আমি বলে দেব।' খগেন দাশগুপ্তর সেবারের নির্বাচনেই আমি প্রথম কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিই। কিন্তু আমার পরিশ্রম সফল হল না। মিলিত বিরোধী শক্তির কাছে খগেনবাবু পরাজিত হলেন এবং বাইরে চেলে গেলেন বেশ কিছুদিনের জন্য। এইসব কারণে মাস দেড়েক কেটে গিয়েছিল। কিন্তু খগেনবাবু তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির ব্যাপারে কিছুই বলে যাননি! ফলে আমি আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরলাম না। সেই রবীন্দ্রনাথ জুনিয়র হাই স্কুলেই মাস্টার হয়ে পুনরায় যোগ দিলাম।

'৬৭-র নির্বাচনে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল, সেটা ন'মাস ক্ষমতায় থাকার পর আশু ঘোষের চালে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। আমরা সেই 'ন'মাস' উক্ত সরকারের কাজকর্মের উপর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম '৬৯-এ। ছাত্র পরিষদ তখন কংগ্রেসের হয়ে একাই প্রায় লড়ছে। তারাই ছিল এর উদ্যোক্তা। নাম ছিল 'অন্ধকারের দিনগুলি'। মালদা থেকে ছাত্র নেতা গৌতম চক্রবর্তী প্রদর্শনীর জন্য ছবি নিয়ে এসেছিল। সে পরে মালদার এমএলএ-ও হয়েছিল। তখন কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি প্রতাপচন্দ্র চন্দ। প্রিয়দা রাজ্য ছাত্র পরিষদের অফিস পরিচালনা শুরু করেছেন মহাজাতি সদন থেকে। শহরের পান্ডাপাড়ায় কংগ্রেস ভবনের নিয়ন্ত্রণ রবি শিকদারের হাতে। তিন দিনের প্রদর্শনী সেখানেই হবে। আমরা সভাপতি নির্বাচন করেছিলাম নিত্যগোপাল মজুমদারকে। সে ছিল অন্তিদার অনুগামী, এবং সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে জলপাইগুড়ি আদালতে মামলা করেছিল রবি শিকদারের বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় মুকুল ভৌমিক পরামর্শ দিল নিত্যগোপালকে দিয়ে কংগ্রেস ভবনে প্রদর্শনীর ফিতে কাটাতে। সেটাই হল। তিন দিনের প্রদর্শনীর প্রথম দিন ভালই কাটল। পরদিন কংগ্রেস ভবনে গিয়ে দেখি প্রদর্শনীর চিহ্নমাত্র নেই। ছবি, গৌতম— সব যেন কর্পূরের মতো মিলিয়ে গিয়েছে। কোথায় গেল? খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, কলকাতা থেকে রহস্যময় নির্দেশের কারণে গতকাল রাতেই পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে ট্রাক থামিয়ে সব তুলে দিয়ে গৌতম চক্রবর্তী চলে গিয়েছে।

সভাপতি প্রতাপবাবু তখন কী জানি একটা কাজে শিলিগুড়ি এসেছিলেন এবং বাগডোগরা দিয়ে ফিরবেন। আমি, মেজদা (বাবলুদা), মুকুল— তিনজনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলাম, কেন এভাবে প্রদর্শনী রাতারাতি উধাও হয়ে গেল।

শুনে প্রতাপবাবু বললেন, 'যে নেতা সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে মামলা করেছে, সেই নেতাকে দিয়ে তোমরা ফিতে কাটিয়ে নেতৃত্বের অবমাননা করেছ। এর পরেও কি প্রদর্শনী থাকে?'

এই শুনে হতাশ মনে তিনজন কংগ্রেস করব কি না— ভাবতে ভাবতে বাগডোগরা বাজারের দিকে হাঁটছি বাস ধরবার জন্য। তখন শ্রমিক নেতা রঞ্জিত ঘোষকে দেখা গেল একটা জিপ চালিয়ে আসছেন। মুকুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। মুকুল হাত দেখিয়ে তাঁকে থামাল। তিনি আমাদের কাছে সব শুনে প্রবোধ দেওয়ার স্বরে বললেন, 'এত অভিমান করলে কি চলে? এমন তো ঘটেই থাকে! রবিদা কি আমাকেও জলপাইগুড়িতে রাজনীতি করার সুযোগ দিল? দিল না বলেই তো এই বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে লড়ে যাচ্ছি।'

অতএব প্রিয়দার নেতৃত্বে আবার জোরদার ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। তারপর ঘটল সেই নৃশংস ঘটনা। সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড। ১৭ মার্চ ১৯৭০।

(ক্রমশ)

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১

পটলরামের গুরু পর্যটক শ্রীচরণগতি গোস্বামী নাকি তাঁর একমাত্র গ্রন্থ 'পদব্রজে ব্রজধাম'-এ ডুয়ার্সের একটা জায়গায় নাম উল্লেখ করতে গিয়ে রহস্য করে লিখেছিলেন— 'এত দেশ ভ্রমণ করিলাম। পাসপোর্ট ছাড়া একখানা দেশে একখানাই 'ভিসা' লাগত। অথচ এই স্থানের নাম শুনিয়া বোধ হইল যে, অন্তত এক ডজন ভিসা না মিলিলে যাওয়া মুশকিল হইবে।'

অনেকের মতে এটা ছাপার ভুল। কিন্তু 'পদব্রজে ব্রজধাম' এখন দুষ্প্রাপ্য। এক কপির দাম বাজারে লাখখানেক। তাই মিলিয়ে নেওয়া যায়নি। আপনার কী মনে হয়?

২

বিজ্ঞপ্তি

'সম্প্রতি উদ্‌বেগের সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, আমাদের করিডর ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকায় জবরদখলকারী দোপেয়েরা আমাদের বিচরণকে অনুপ্রবেশ অভিযোগে খচ্চর অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিহীন আচরণ করিতেছে। এই বিষয়ে একটি জরুরি আলোচনা দরকার। অতএব, আগামী দোলপূর্ণিমার নিশীথে আম কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়িতে গজধূলাধিপতিদের উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে। ইতি। স্বাক্ষর- গজরত্ন কুলোকর্ণ। বিঃদ্রঃ- আলোচনান্তে তুলাইপাঞ্জি চাউল এবং রংপোতা চা-বাগানের হাড়িয়া সহযোগে কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা থাকবে।'

সবই তো বুঝলেম! কিন্তু 'আম কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়িটা কোথায় ভাই?'

গতবারের উত্তর— ১) ফালাকাটা ২) হলদিবাড়ি আর ময়নাগুড়ি ৩) বীরপাড়া

প্রথম সঠিক উত্তরদাতা—
পিঙ্কি রায়, ফালাকাটা। **প্রবুদ্ধ ঘোষ**, মালদা

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

২১

পবন মণ্ডলকে জরুরি কাজের অজুহাত দিয়ে হিদারু আর গগনেন্দ্র নয়ার হাটের আগে রেল লাইনের সামনে যখন এল, তখন ঘড়ির কাঁটা আটটা ছুঁয়ে ফেলেছে। রেল লাইনের আগে লাইন বরাবর খালের সমান্তরালে একটা মেঠো রাস্তা উত্তর দিকে চলে গেছে। জায়গাটা বেশ নিচু। মাঝে মাঝেই জলা আর ডোবা-পুকুর। মাটির রাস্তাটা তার মধ্য দিয়েই প্রায় সোজা চলে গেছে। বৃষ্টির পর আকাশ এখন ঝকঝকে। তারার আলোয় আবছা বোঝা যাচ্ছিল আশপাশ। মেঠো রাস্তার মোড়ে দু'জন দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। জায়গাটা একদম নির্জন বললে ভুল হবে। হাটের দিক থেকে তলায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে আসা গোরুর গাড়ি কিংবা দু'-চারজন মানুষ টুকটাক আসছিল। হাটের দিকে আলোও জ্বলে থাকতে দেখা যাচ্ছিল বেশ কয়েকটা। ওরা দু'জন কী করবে বুঝতে না পেরে ঠিক কাঁচা রাস্তাটার মাথাতেই অপেক্ষা করতে লাগল। নরেন্দ্র বলে একটি ছেলে তাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে একটা বাড়িতে। সেখানে উপেনের সংবাদ পাওয়া যাবে।

কিন্তু উপেন কি আসবে?

উত্তেজনায় দু'জনই মনে মনে ছটফট করছিল। গগনেন্দ্রকেই মনে হচ্ছিল বেশি উত্তেজিত। সে ফিসফিস করে হিদারুকে বলল, 'নরেন্দ্র ছেলেটা যদি না আসে?'

—তারিণী বসুনিয়ার খবর ভুল খাওয়ার কথা না। হিদারু আশ্বস্ত করার সুরে জানায়। তখনই দেখা গেল, রেল লাইন পেরিয়ে লণ্ঠন হাতে একজন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সে ওদের দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লণ্ঠনটা একটু উপরের দিকে তুলে হিদারুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনিই তো হিদারুদা? আপনাকে আমি চিনি। উনি নিশ্চয়ই গগনেন্দ্রবাবু?'

—তাহলে আপনি অবশ্যই নরেন্দ্র? গগনেন্দ্র জবাব দিল। লণ্ঠনের আলোয় লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছিল বয়স বেশি নয়। চোখে-মুখে মোঙ্গলয়েড জনগোষ্ঠীর স্পষ্ট ছাপ।

—আমিই নগেন্দ্র রায়। কাছেই তারিণীদার এক সাগাইয়ের বাড়ি। সাগাই বুঝলেন তো?

প্রশ্নটা গগনেন্দ্রর প্রতি। সে মৃদু হেসে বলল, 'বুঝব না কেন? সাগাই হল রিলেটিভ। তোমাদের দেশি ভাষা আমিও জানি খানিকটা।'

—আসুন।

ছেলেটি মাটির রাস্তায় নেমে পড়ল। পিছনে সামান্য তফাতে ওরা দু'জন। পথটা কোথাও জলা-ডোবা ঘেঁষে, কোথাও মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। লণ্ঠনের হলুদ ও মলিন আলোয় চারপাশটা এর বেশি বুঝতে পারছিল না গগনেন্দ্র। হিদারু অবশ্য দিনের বেলায় এদিকটা আগেই দেখেছে। উত্তরে খানিকটা এগলে একটা-দুটো বাড়িঘর দেখা যাবে। সেটা একটা নতুন গজিয়ে ওঠা পাড়ার পিছন দিকটা। কিন্তু সে পাড়াতে যাওয়ার ভাল রাস্তাটায় আসতে হয় কদমতলা থেকে অন্য পথে।

—এদিক দিয়ে না এলেও তো চলত? হিদারু জানতে চায়।

—এইদিক দিয়ে রাতের বেলায় এলে লোকের নজরে পড়ার চান্স খুব কম। পাড়ার শেষ বাড়িটাতেই আমরা থাকি।

—আর কে আছে সে বাড়িতে?

—আমরা দু'জন একই গ্রাম থেকে এসে এখানে আছি। নিজেরা রান্না করে খাই। ম্যাট্রিক দেব বলে জলপাইগুড়িতে এসেছি। নইলে ও বাড়িতে আর কেউ থাকে না। আমাদের গ্রামের দেউনিয়া যজ্ঞেশ্বর বর্মনের বাড়ি এটা। উনি কংগ্রেস করেন। তারিণীদা ওর নেতা। গতকাল দুপুরেই তাঁর লোক এসে উঠেছে এ বাড়িতে।

—কী নাম তাঁর? উপেন? গগনেন্দ্রর গলায় ব্যগ্র ভাব ফুটে ওঠে। কিন্তু তাকে এবং হিদারুকে একটু হতাশ করে নরেন্দ্র বলে যে, উপেন নামের কেউ আসেনি। যে এসেছে, সে নিজের নাম বলতে নিষেধ করেছে ঠিকই, কিন্তু সে উপেন নয়। হিদারু তাকে চেনে।

বাঁশ দিয়ে বানানো একটা ছোট্ট সাঁকো পেরিয়ে ওদের দু'জনের মনে হল, কোনও একটা বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখটা একটু সয়ে

বিছানায় সোজা হয়ে বসে বললেন তারিণী বসুনিয়া। হিদারুর বিস্ময় তখনও অব্যাহত। তারিণী বসুনিয়া জলপাইগুড়িতে? এ যে অবিশ্বাস্য! গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পর জেলা জুড়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। জলপাইগুড়ি শহরে তো প্রায় তুলকালাম অবস্থা গেছে এ বছর। ক'দিন আগে করলার ঘাটে দুর্গা পুজোর বিসর্জনের দিনেও গমগম করে প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ।

যেতেই বুঝতে পারল সামনেই একটা বাড়ি। নগেন্দ্র লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরতেই বোঝা গেল, টিনের চাল দেওয়া ডাবওয়ালার বাড়ি একখানা।

—এখানেই থাকি আমরা। নগেন্দ্র বলল। তারপর সামান্য গলা তুলে ডাকল, 'যোগেন! যোগেন!'

অন্ধকার ফুঁড়ে নগেন্দ্রর বয়সি একটা ছেলে কোত্থেকে উদয় হয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। নরেন্দ্রর হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে বাড়িটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল সে। তাকে অনুসরণ করে বাড়ির ভিতরের উঠোনে এসে পড়ল হিদারু আর গগনেন্দ্র।

—এই ঘরে।

বারান্দায় উঠে একটা দরজার দিকে ইঙ্গিত করল ছেলেটি। তারপর দরজাটা ঠেলে খুলে দিল। বোঝা গেল, ভিতরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। অসীম আগ্রহ নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল দু'জন। পিছন পিছন নিঃশব্দে নরেন্দ্র।

ঘরটা বেশ বড়। একটা বড় খাটে একজন মানুষ আধশোয়া অবস্থায় হাত বাড়িয়ে পাশের তেপায়ায় রাখা টেবিল ল্যাম্পের আলোটা বাড়িয়ে দিতেই দু'জন দেখল, গোটা ঘরে তৃতীয় কোনও আসবাব নেই। আধশোয়া ব্যক্তিটির মুখটা তখনও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু তার ভঙ্গি দেখে হিদারুর তীব্র সন্দেহ হল। এ ব্যক্তি সে না হয়ে যায় না।

—বারান্দা থেকে বেঞ্চটা নিয়ে আয় তো।

ব্যক্তিটি নির্দেশ দিলেন। সেই মুহূর্তে হিদারু প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'সে কী! আপনি এখানে?'

—আস্তে হিদারু! ব্যক্তিটি নরম গলায় বললেন। তারপর গগনেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চিনতে পারছ না গগন? খুব বেশি তো দেখা হয়নি আমাদের!'

গগনেন্দ্রও চিনতে পেরেছে এতক্ষণে। কয়েক মাস আগেই অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে হাতি দিয়ে এই লোকটির ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়েছে সাহেবরা। কিন্তু তার আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অনেকেই জানে যে সে ব্যক্তি নিরুদ্দেশ। রামশাইয়ের উত্তরে গভীর অরণ্যে কোথাও আত্মগোপন করে আছেন। অথচ তিনি জলপাইগুড়িতে আর ওদের সামনে!

ঢিপ করে একটা প্রণাম করে গগনেন্দ্র আপ্লুত স্বরে বলল, 'এই জন্যেই নরেন্দ্র আপনার নাম বলেনি?'

'আমিই না করেছিলাম। চমক বলে একটা ব্যাপার আছে না?'

এবার বিছানায় সোজা হয়ে বসে বললেন তারিণী বসুনিয়া। হিদারুর বিস্ময় তখনও অব্যাহত। তারিণী বসুনিয়া জলপাইগুড়িতে? এ যে অবিশ্বাস্য! গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পর জেলা জুড়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। জলপাইগুড়ি শহরে তো প্রায় তুলকালাম অবস্থা গেছে এ বছর। ক'দিন আগে করলার ঘাটে দুর্গা পুজোর বিসর্জনের দিনেও গমগম করে প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ। চারু সান্যাল, শচীন দাশগুপ্ত, সতীশ লাহিড়ি-সহ অনেক নেতাকে ঘাট থেকেই ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। ধূপগুড়ি হাটে পিকেটিং, পচাগর হাটে পিকেটিং, পাথরঝোরা চা-বাগানে বিটন সাহেবকে কোদাল দিয়ে হত্যা, রামশাই হাটে আন্দোলন, মাদ্রাসা মাঠে মাখন ভৌমিকের রক্ত গরম করা ভাষণ— ঘটনার অভাব হয়নি গত কয়েক মাসে। খগেন দাশগুপ্ত জেলে। হিদারু শুনেছে, তাঁর ছেলের জন্য দুধ কেনার পয়সা ছিল না খগেনবাবুর পরিবারের। চারু একটা পুস্তিকা লিখেছিল। তার নাম 'সংসার চলবে কেমন করে'। রবি শিকদার সে পুস্তিকা শহরের ঘরে ঘরে বিলি করেছেন নিজের হাতে। একটা কপি হিদারুর বাড়িতেও আছে। জেলা আর শহরের অনেক মানুষ এখনও জেলে। অথচ সব কিছু উপেক্ষা করে তারিণী বসুনিয়া এখানে!

টেবিল ল্যাম্পের আলোয় হিদারু ভাল করে দেখল তারিণী বসুনিয়াকে। চেহারা বিন্দুমাত্র বদলায়নি। মনেই হয় না তিনি সাংঘাতিক ঝুঁকির মধ্য দিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। বছরের গোড়ায় যেমন রথের হাটের বাড়িতে তাঁকে দেখেছিল হিদারু, ঠিক তেমনই আছেন।

প্রাথমিক চমক কাটিয়ে এবার তারিণী বসুনিয়ার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল হিদারু। ততক্ষণে একটা নড়বড়ে বেঞ্চি ঘরে এনে রেখেছে যোগেন নামের ছেলেটা।

—বোসো তোমরা। তারিণী বসুনিয়া বললেন।

ওরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসল। উপেনের খবর নিশ্চয়ই জানেন তিনি। গগনেন্দ্রর খুব ইচ্ছে করছিল সে খবর জানতে, কিন্তু কিছু বলতে পারছিল না। উত্তেজনা আর বিস্ময়ের যৌথ প্রাবল্যে সব গুলিয়ে যাচ্ছিল তার।

—উপেন আছে আলিপুরদুয়ারে। সেখানেও গান্ধিজির ডাকে খুব মুভমেন্ট হচ্ছে। সেখানে হাই স্কুলের মাঠে লবণ বানিয়ে আইন ভাঙার খবর তোমরা জানো কি না জানি না। বক্সা বলে একটা জায়গায় বন্দি শিবির রয়েছে। বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এসেছিলেন সে শিবির দেখতে। গান্ধিজিই পাঠিয়েছিলেন। এই নাও।

একটা দেশলাইয়ের বাক্স বার করে আলোটার সামনে রাখলেন তারিণী বসুনিয়া। গগনেন্দ্র বাক্সটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'এ দিয়ে কী হবে?'

—এতে বার্তা আছে। আলিপুরদুয়ারে এভাবেই দেশলাই বাক্সের মধ্যে কাগজের পুরিয়াতে খবর লিখে কংগ্রেসিরা গোপন খবর আদানপ্রদান করে। এ দেশলাই উপেন পাঠিয়েছে।

বাক্সটার উপর তর্জনী দিয়ে দুটো টোকা মেরে কথাটা বললেন তারিণী বসুনিয়া। বাইরে তখন কী একটা কারণে শেয়ালদের সমবেত হুক্কাহুয়া ডাক শুরু হয়েছে। খোলা দরজা দিয়ে শিরশির করে আসছে ঠান্ডা হাওয়া।

গগনেন্দ্র ছোঁ মেরে তুলে নিল দেশলাইয়ের বাক্সটা।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

আপনিও হতে পারেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রতিবেদক। আপনার এলাকায় কোনও উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা হলে তাই নিয়ে প্রতিবেদন লিখে পাঠাতে পারেন। প্রতিবেদনটি যেন ২৫০ শব্দের মধ্যে হয়। সঙ্গে ছবি দিতে ভুলবেন না। লেখা পাঠান এই ঠিকানায়— **'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে 'এখন ডুয়ার্স', মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১।**
ই-মেল- srimati.dooars@ gmail.com

ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির শাসানি-হুমকিতেও ভারতপন্থী ছিটবাসীরা কখনও দমে যায়নি

বাংলাদেশি কুড়িগ্রাম জেলার রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন অছিলায় ভারত ভূখণ্ডের দাশিয়ারছড়ায় ঢুকতেন ভারতপন্থী ছিটবাসীদের ভয় দেখাতে, আর দেখে নেবার হুমকি দিতে, যা এক ধরনের আগ্রাসনেরই নামান্তর। দাশিয়ারছড়ার ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেলেও তা দিয়ে ভারতপন্থী ছিটবাসীদের দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। সেই সব কাহিনি নিয়েই **দ্বাদশ পর্ব**।

ভারতীয় ভূখণ্ড দাশিয়ারছড়ায় ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন আপাতদৃষ্টিতে প্রায় কোনও মহলই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে বাংলাদেশের মৌলবাদী গোষ্ঠীর মদতপুষ্ট ভূমিদস্যুরা তো নয়ই। শুধু তা-ই নয়, যেসব মৌলবাদী শক্তি ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটানো তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ বলে মনে করে, তারাও না। এমনকি যারা নিম্ন আসামে জনবিন্যাস পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, সুকৌশলে ছিটমহলগুলিকে ‘যাত্রী প্রতীক্ষালয়’ হিসেবে ব্যবহার করেছে ভারতে লোক পাচার করতে, তারাও মেনে নিতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে ছিটমহলগুলির স্বঘোষিত কিংবা স্বশাসিত চেয়ারম্যানরা তাঁদের দায় এড়াতে পারেন না। বহু ক্ষেত্রে তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেও এই কাজে মদত দিয়ে থাকতে পারেন। প্রসঙ্গত, দাশিয়ারছড়ায় ২০০৫ সালের স্বশাসিত বোর্ডের নির্বাচন পর্ব বানচাল হবার বিষয়টিও যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। বিষয়টি অনেকটাই এরকম—

১৯৮০ সাল থেকে দাশিয়ারছড়ার স্বশাসিত নির্বাচিত বোর্ডের চেয়ারম্যানরা মোটামুটি একই ধারায় তাদের প্রশাসন পরিচালনা করত। মূল ভূখণ্ডে আসার ক্ষেত্রে তাঁদের ইস্যু করা পরিচয়পত্রকেই সীমান্তরক্ষীবাহিনী মান্যতা দিত। ফলে ছিটমহলগুলিতে তারাই হয়ে উঠেছিল প্রভুত ক্ষমতার অধিকারী। ২০০৫ সালে দাশিয়ারছড়ায় স্বশাসিত বোর্ড নির্বাচনের সমস্ত আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, নির্বাচনী প্রচার পর্ব চলছে জোরকদমে, তখন এই বিচ্ছিন্ন ভারতীয় ভূভাগে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ২০০৫ সালের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদের সম্ভাব্য প্রার্থী মিজানুর রহমানের বয়ান অনুযায়ী, ‘নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হতেই আমি চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে জোরকদমে প্রচারকার্য শুরু করি। নির্বাচনী প্রচার জমে উঠতেই দাশিয়ারছড়ার ঘরোয়া রাজনীতির সমীকরণ দ্রুত বদলাতে শুরু করে। বিদায়ী চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম-সহ প্রাক্তন চেয়ারম্যান আকছার আলি, আজগর আলি এবং ১১টি মসজিদ মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশনের একাংশ জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া বানচাল করতে উঠে-পড়ে লাগে।

মনে হয়, নির্বাচনী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, সঠিকভাবে নির্বাচন হলে চেয়ারম্যান পদে হয়ত বা মিজানুর রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন। কিন্তু মিজানুরকে চেয়ারম্যান হতে দেওয়া যাবে না। অতএব ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ষড়যন্ত্রের জাল পৌঁছায় সীমান্ত পেরিয়ে কোচবিহারের দিনহাটা শহরে। ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতি গঠনের জোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যায়। এই সময়ে দিনহাটায় পৌঁছায় কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার। ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতি বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে মৌলবাদী শক্তি ও স্থানীয় ভূমিদস্যুদের সহায়তায় জোর তৎপরতা শুরু করে। বাংলাদেশে তখন বিএনপি-জামাত জোট সরকারের শাসন। এ ছাড়া বাংলাদেশের উত্তর ভাগে সে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেন মহম্মদ এরশাদের দল বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রভাব-প্রতিপত্তিতেও ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতিকে পরিপুষ্ট করে তোলে। দাশিয়ারছড়ায় শুরু হয় তাদের অতিমাত্রায় সক্রিয়তা।

দীর্ঘ ২৫ বছর স্বশাসিত বোর্ড একটানা প্রশাসনিক দায়ভার সামলানোর পর যখন দেখে দাশিয়ারছড়ায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে, তখন তারা সচকিত হয়ে ওঠে। পরিচয়পত্র বণ্টনের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ তো চলছিলই। সেই সঙ্গে চলছিল ছিটবাসী পরিচয়ে ভারতে প্রবেশ করে এ দেশের জনারণ্যে মিশে যাওয়া। কিন্তু বাংলাদেশি মৌলবাদী শক্তির ওই ধারাবাহিক প্রয়াস হঠাৎ করেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। দাশিয়ারছড়ার পরিবর্তনের হাওয়া সাবেক চেয়ারম্যানদেরও আতঙ্কিত করে তোলে, যার ফলশ্রুতিতে তাদের অভিন্ন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় যেনতেন প্রকারেণ নির্বাচনকে বানচাল করা। অতএব ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতিকে সামনে রেখে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত ভেস্তে দিতে তারা সম্মত হয়। কিন্তু দাশিয়ারছড়ার ছিটবাসীরা এই ঘটনাক্রম সহজ মনে মেনে নিতে পারেনি।

নির্বাচন করার দাবিতে সেখানে শুরু হয় মিছিল-মিটিং। শেষ পর্যন্ত দাশিয়ারছড়ার ছিটবাসীরা দু’টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই ডামাডোলের মধ্যে দাশিয়ারছড়ার স্বশাসন পর্বের অবসান ঘটলেও যুযুধান দুই পক্ষের দ্বৈরথ কিন্তু অব্যাহত থাকে। কালিরহাটে দুই পক্ষ তাদের আস্তানা তৈরি করে। এক পক্ষ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির দপ্তর বানিয়ে তৎপরতা শুরু করে। তাদের লক্ষ্য ছিটমহলের বাংলাদেশপন্থী বাতাবরণ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করা যে, ছিট বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে তারা সবাই বাংলাদেশি হতে আগ্রহী। অপর দিকে যারা খোলা মনে নিজেদের ভারতীয় হিসেবে পরিচয় দিয়ে ছিটে বসবাস করতে আগ্রহী, তারা মিজানুর রহমানের অনুগামী হিসেবে ‘মিয়ান ক্লাব’ তৈরি করে পৃথক সত্তা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। মিয়ান ক্লাবে প্রতিদিন সকালে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হত এবং সন্ধ্যার আগে তা আবার নামিয়ে রাখা হত। প্রতি বছর ঘটা করে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করত মিয়ান ক্লাবের সদস্যরা। অর্থাৎ মিয়ান ক্লাবকে কেন্দ্র করে ভারতপন্থী একটা বাতাবরণ দাশিয়ারছড়ায় জারি ছিল। যদিও এটাকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহল ভাল চোখে দেখত না, তথাপি এরা তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি।

দাশিয়ারছড়ায় ছিটমহল বিমিয় সমন্বয় সমিতির দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল— এ কথা যেমন ঠিক, কিন্তু তা দিয়ে যে ভারতপন্থী ছিটবাসীদের দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি, সে কথাও মানতে হয়। তাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেদের স্বতন্ত্রতা ও স্বকীয়তা বজায় রাখতে চেষ্টার কসুর করেননি। তবে যা তাঁরা করেছেন তা অনেকটাই নিজেদের মতো করে।

পক্ষান্তরে ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতি কালিরহাটে দপ্তর তৈরি করে বাংলাদেশপন্থী কার্যকলাপ পুরো মাত্রায় শুরু করে। তারা প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস, ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস এবং ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মদিনে শহিদ দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ড দাশিয়ারছড়ায় এক নতুন আগ্রাসনের জন্ম দেয়। প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর ও ২৬ মার্চ প্রথম দিকে নিয়ম করে উদ্‌যাপন করলেও ১৫ অগাস্ট উদ্‌যাপন করা শুরু হয় বিএনপি-জামাত সরকার পতনের পর।

মিজানুর রহমানের ভাষায়, ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতি মূলত বিএনপি-জামাত শিবির ও জাতীয় পার্টির প্রত্যক্ষ মদতপুষ্ট সংগঠন। বাংলাদেশ প্রশাসনের একাংশ এই সংগঠনকে পৃষ্টপোষকতা প্রদান করত এবং প্রকাশ্যে মদত দিত। বিএনপি-জামাত সরকারের পতনের পর এরা আওয়ামি লিগের কাছাকাছি পৌঁছাতে ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধুর শহিদ দিবস উদ্‌যাপন শুরু করে। এদের কর্মসূচিতে দাশিয়ারছড়া ছিটমহলের খুব সামান্য সংখ্যক মানুষই হাজির হত। বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে বিএনপি-জামাত শিবির ও জাতীয় পার্টির সমর্থক এনে এরা লোকসমাগম ঘটাত। যদিও বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম ছিটবিনিময় সমন্বয় সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে বহুল মাত্রায় প্রচারে আলোকিত করতে অতি মাত্রায় দরাজ ছিল। প্রচারের আলোয় তারা দাশিয়ারছড়ার মানুষ কতটা বাংলাদেশপন্থী, সেই কথা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত। প্রকৃত সত্য যদিও থেকে যেত আড়ালে। এটাই ক্রমশ বাংলাদেশি কূটনীতির একটা কৌশল হয়ে ওঠে। তারা ভারতেও তাদের এজেন্ট তৈরি ফেলে। ওইসব এজেন্ট বিভিন্ন কৌশলে ছিটমহল বিনিময়ের নজরকাড়া স্লোগান ও ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির ভাবাবেগকে মূলধন করে ভারতের সংবাদমাধ্যমের অনুগ্রহলাভে জোর তৎপরতা শুরু করে। সেই সঙ্গে উদ্যোগী হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মন কাড়তে।

ইতিমধ্যে ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির দিনহাটা নিবাসী এক কর্মকর্তার আনাগোনা শুরু হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দপ্তরে। ওই সময়েই কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার দিনহাটা শহরে আসেন। তিনি ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির জনৈক শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে একটি বৈঠকও করেন, যেটি যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু বিষয়টি ভারতীয় গোয়েন্দাদের নজর এড়ায়নি।

দাশিয়ারছড়ায় ছিটমহল বিমিয় সমন্বয় সমিতির দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল— এ কথা যেমন ঠিক, কিন্তু তা দিয়ে যে ভারতপন্থী ছিটবাসীদের দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি, সে কথাও মানতে হয়। তাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেদের স্বতন্ত্রতা ও স্বকীয়তা বজায় রাখতে চেষ্টার কসুর করেননি। তবে যা তাঁরা করেছেন তা অনেকটাই নিজেদের মতো করে। ২০১২ সালে দাশিয়ারছড়ার মিয়ান ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে ভারতপন্থী ছিটমহলবাসীদের সংগঠন ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের যোগাযোগ ঘটে। ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগের পর মিয়ান ক্লাবের সদস্যরা সদলে কাউন্সিলে যোগদান করেন। দাশিয়ারছড়ায় ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের শাখা গঠিত হয়। মিয়ান ক্লাবটি অতঃপর এই সংগঠনের দপ্তরে পরিণত হয়। মিজানুর রহমান মিয়ান হন ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের, অন্য দিকে রহমান মিয়ান হন ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের দাশিয়ারছড়া শাখার সভাপতি। মিজানুরের নেতৃত্বে দাশিয়ারছড়ায় শুরু হয় ভারতপন্থী ছিটবাসীদের এক নতুন সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম ছিল ভারতীয় নাগরিকত্বের সংগ্রাম।

তবে ওই সংগ্রাম খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। কারণ, তাদের পাশে তখনও পর্যন্ত কেউ ছিল না। উলটো দিক থেকে ছিল অনবরত হুমকি, ভয় দেখানো, বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে লোক আমদানি করে মাইক বাজিয়ে সভা, ফুলবাড়ি উপজেলা পরিষদের সর্বাধিনায়কের আস্ফালন, দিনহাটা নিবাসী ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির শীর্ষনেতার একগাল দাড়ি নিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছোড়াছুড়ির মতো ঘটনা। তবে ওই ধরনের হুমকি-শাসানি-ভীতি প্রদর্শন ইত্যাকার ঘটনা কখনওই ভারতীয় সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরায় সদাব্যস্ত বিএসএফ জওয়ানদের চোখ এড়াত না। এটাই মনে হয় দাশিয়ারছড়া ছিটমহলবাসীদের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল। প্রতিটি ঘটনার উপর বিএসএফ জওয়ানের তীক্ষ্ণ নজর দাশিয়ারছড়াবাসীদের কাছে ছিল যেন খড়কুটোর মতো। বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্ত অতিক্রম করতেন না ঠিকই, তবে একটু বেয়াদবি দেখলেই বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডকে সতর্ক করতে বিন্দুমাত্র সময় নিতেন না। প্রয়োজনে ফ্ল্যাগ মিটিং ডেকে কড়া প্রতিক্রিয়া জানালে বেয়াদবরা তাৎক্ষণিক সংযত হয়ে যেত।

কিন্তু প্রশ্ন একটাই, দাশিয়ারছড়া ছিটমহল পরিবেষ্টিত বাংলাদেশি কুড়িগ্রাম জেলার তাবৎ রাজনৈতিক নেতা বিভিন্ন অছিলায় ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির আহ্বানে ভারত ভূখণ্ড বলে পরিচিত দাশিয়ারছড়ার অভ্যন্তরে আসতেন কেন? তা কি প্রতিনিয়ত ভারতপন্থী ছিটবাসীদের ভয় দেখাতে আর দেখে নেবার হুমকি দিতে? এ তো এক ধরনের আগ্রাসনেরই নামান্তর। তা-ই নয় কি? অন্য দিকে ভারতের দিনহাটা নিবাসী এক প্রাক্তন বিধায়কের পুত্র ছিটমহল বিনিময়ের দাবিকে সামনে রেখে ওইসব বাংলাদেশি নেতার সঙ্গে সুর মেলালেন। পাশাপাশি ভারতপন্থী ভারতীয় ছিটমহলবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে চক্রান্তের জাল বিস্তার করলেন। এখানেই শেষ নয়, সভা-সমাবেশ করে ভারতপন্থী ছিটবাসীদের নেতা মিজানুর রহমানকে দেখে নেবার হুমকি দিতেও ছাড়েননি। আর যা-ই হোক, এ যে কোনও দেশপ্রেমিকের ভাবনা নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

(ক্রমশ)

দেবব্রত চাকী

চুয়াপাড়ার চুড়েইল

রম্যাণী গোস্বামী

বিকেলটা ফুরিয়ে গিয়ে পশ্চিম আকাশের বুক জুড়ে সবে হালকা বেগুনি রঙের ছোপ পড়তে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময় গাড়িটা এসে দাঁড়াল রিসর্টের নাম খোদাই করা কাঠের বোর্ডটার নিচে। গাড়ি থেকে নামল দুই যুবক। একজনের গলায় বাইনোকুলার ঝুলছে। অন্যজনের কাঁধে দামি ক্যামেরার ব্যাগ। ওদের পিছুপিছু নেমে এল দু'টি মেয়ে। সবার গায়ে শীতের পোশাক। মাথায় উলের টুি ৩৬প। ওরা নিজেরাই নিজেদের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে তরতর করে উঠতে লাগল শালবনের ভিতরের পাথর দিয়ে বাঁধানো ধাপে ধাপে ওঠা সিঁড়ি বেয়ে। প্রথম যুবক পকেট থেকে মোবাইল বার করে কী যেন দেখল। তারপর বলে উঠল, 'সিগনাল নেই রে জয়। উফ শালা, কী খিদে পেয়েছে মাইরি।'

পাশের জনের ভুরু কুঁচকে গেল, 'বলিস কী? তোরটায় সিগনাল না পেলে আমাদের কারওটায় পাওয়ার কোনও চান্স নেই।'

একটি মেয়ে তা-ই শুনে বলল, 'বেশ হয়েছে। সারাক্ষণ খালি তোর সায়মদার ক্লায়েন্টদের ফোন আর ফোন! বেড়াতে এসেও শান্তি নেই। এমন জায়গায় এসে অফিসের কচকচি ভাল লাগে বল তো?'

প্রশ্নটা যার উদ্দেশে করা, সে মৃদু ঘাড় নেড়ে সায় দিল। তারপর বলে উঠল, 'কিন্তু কেয়ারটেকার কোথায়? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না মিলিদি। শুধু বড় বড় গাছ আর কী লোনলিনেস!'

শুনে হেসে ফেলল মল্লিকা ওরফে মিলি। 'তুই কি ভয় পেয়ে গেলি নাকি সুম? এই দেখো জয়, তোমরা বউটা কী দারুণ ভিতু। আরে, এই নির্জনতার খোঁজেই তো এখানে আসা রে!'

সায়ম নামক সেই যুবক শব্দ করে হাসল। বলল, 'ভিতু না হলে কি কেউ নিজেদের হানিমুনে আমাদের দু'জনকে টেনে আনে?'

জয়দীপ সবার নজর এড়িয়ে এক বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল ওর স্ত্রীর দিকে। মুখ টিপে হাসল সুমনা। সূর্যাস্তের মায়াবী আভা এসে রাঙিয়ে দিল ওর ফরসা মুখশ্রী।

'ওই তো ডাইনিং। আলো জ্বলছে। ওখানেই লোকজন আছে, চলো। আরে বাবা, অনলাইন বুকিং করে এসেছি। পেমেন্টও কমপ্লিট। ডোন্ট ওরি!' সায়ম বরাভয়ের ভঙ্গি করল। ওর পরিশ্রান্ত মুখে এখন চিলতে হাসির আভাস।

ওরা প্রবল উদ্যমে ঘোরানো আঁকাবাঁকা পাথরের পথ ধরে চড়াই বেয়ে উঠতে লাগল ডাইনিং হল লক্ষ্য করে। বেতের ফ্রেম ঘেরা জানালা দিয়ে ওদের আসতে দেখে ডাইনিং থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে এল রেশম দাজু আর ওর বউ।

কফি পর্ব শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে চারজন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল দূরের নীল কটেজটার দিকে। ডাইনিং থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা ঢালু হয়ে চলে গিয়েছে কটেজ পর্যন্ত। কটেজটা প্রায় ঝুলে আছে খাদের কিনারায়। নিচে ঢেউয়ের মতো উপত্যকায় ঠিক যেন কালচে সবুজরঙা কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে কেউ। সেই সবুজ কার্পেটের নাম চুয়াপাড়া টি এস্টেট। রাস্তায় আসার পথেই পাথরের ফলকে নামটা দেখেছে ওরা। কটেজের ঠিক পিছনে গাঢ় ধূসর আকাশে লাল রঙের বিশাল চাঁদ উঠেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে সেই লালচে চাঁদ উঁকি দিয়ে দেখছে যেন নতুন অতিথিদের। দূরে পাহাড়ের গায়ে সার সার আলো ফুটে উঠেছে। ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে কটেজের দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটার উপর। ডিসেম্বরের অসহ্য শীত, তবুও যেন সবার পা আটকে গিয়েছে এই সীমাহীন সৌন্দর্যের মাঝে দাঁড়িয়ে। নীল কটেজটার বারান্দায় জ্বলছে একটা নীল পি-এল ল্যাম্প। সাজানো বেতের চেয়ার-টেবিলগুলো যেন ডুবে রয়েছে সেই নীলাভ জ্যোৎস্নায়।

'দ্য ব্লু ব্লসম! ইট'স হেভেন!' স্বগতোক্তি করে বলল জয়দীপ।

সায়ম জয়দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিক্রমদার রেফারেন্স। মালটা আমাকে কখনও ডোবায়নি। যত অফবিট জায়গায় গিয়েছি, সব ওর কাছ থেকে জেনে নিয়ে। কী রে সুম, জায়গাটা পছন্দ হয়েছে তো তোদের?'

কেউ কিছু বলল না। গভীর মুগ্ধতাবোধ ওদের অন্তর থেকে নিঃসৃত কয়েকটি শব্দের জন্ম দিল শুধু। তারপর এলোমেলো পদক্ষেপে ওরা এগিয়ে গেল গন্তব্যের দিকে। ওদের ঠিক পিছনেই তখন ঘন অন্ধকারের চাদরটা কনকনে বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

২

কী যে বেড়াতে এসেই এদের এই মদ গেলা, ভাল লাগে না ছাই। মনে মনে ভাবল সুমনা। একটা আড়মোড়া ভেঙে গায়ের শালটা ভাল করে জড়িয়ে গুটিসুটি মেরে সে বসল বেতের চেয়ারে পা দুটো ভাঁজ করে। ঠান্ডা হাওয়ায় কেটে যাচ্ছে যেন মুখ। তবুও আরাম লাগছে। দূরের পাহাড়টার গায়ের আলোর ফুলকিগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘোর লাগা চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল সুমনা। একটু আগে কটেজের পাশে ফাঁকা জায়গায় কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল রিসর্টের কোনও একজন স্টাফ। আগুন ঘিরে গোল করে চেয়ারে বসে হাত-পা সেঁকছিল ওরা সবাই। ফটফট শব্দ করে ফাটছিল বাঁশ। কমলা লাল বেগুনি বর্ণের মোটা লকলকে শিখাটার দিকে তাকিয়েও কেমন ঘোর লেগে যাচ্ছিল ওর।

সায়মদা কটেজে ঢুকেই ব্যাগ থেকে বার করে ফেলেছে স্কচের বোতলটা। তারপর থেকেই চলছে 'উল্লাস' আর তিনটে গ্লাসের ঠুং ঠুং। মিলিদি ওকে অনেকবার সেধেছিল। এই ঠান্ডায় একটু খা, জাস্ট দুটো পেগ, আমিও তো নিচ্ছি... এইসব বলছিল। অভয় দিয়েছে জয়ও। কিন্তু সুমনা রাজি হয়নি। আসলে জিনিসটা ওর মোটেই সয় না। বিয়ের আগে একবারই জয়ের প্রচণ্ড সাধাসাধিতে খেতে হয়েছিল। ভদকা বোধহয়। পরদিন মনে হচ্ছিল মাথার মধ্যে কেউ যেন দুরমুশ পেটাচ্ছে। সঙ্গে বীভৎস গা গোলানো। আর ওসব ছোঁয়নি।

উষ্ণ ওম নিতে নিতে ড্রিঙ্কসের গ্লাস হাতে সায়মদা গলা ছেড়ে গান গাইছিল। সবই রবীন্দ্রসংগীত। এক সময় ভালই গাইত সায়মদা। চর্চিত গলা। কিন্তু এখন আর দম পাচ্ছে না।

'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি, প্লিজ সায়মদা। আমার খুব প্রিয় গান।' সুমনা অনুরোধ করল। ও গাইতে পারে না, কিন্তু শুনতে ভালবাসে। 'সব যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো'— এই জায়গাটায় এসে গলা চিরে গেল সায়মের।

'ধুর শালা, আর পারি না রে গাইতে। যা ঠান্ডা। মাথার টুপি ভিজে সপসপ করছে। চল, ওঠা যাক। ঘরে বসে আড্ডা হবে।' টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল সায়মদা। জয়ের দূর সম্পর্কের এই কাকাতো দাদা ভারী স্নেহ করে ওকে। নিজের বোনের মতো।

বেশ বড় অ্যাপার্টমেন্ট। পাশাপাশি দু'খানা ডাবল বেডরুম। মাঝখানে কমন ড্রয়িং স্পেস। সেখানেই সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে খানিকক্ষণ আড্ডার পরেই সুমনার মনে হল যে তাল কেটে যাচ্ছে। সায়মদার সেই বহুবার বলা পচা জোকগুলো শুনে অথবা না শুনেই হ্যা হ্যা করে হাসছে জয়-মিলিদি। জয় কী যেন একটা বলতে গেল, গলা জড়িয়ে গিয়েছে, কিচ্ছু বোঝা গেল না। মিলিদি, 'শোন না, এই সুম, শোন না' করে ওর হাত ধরে টানছিল। হতাশ সুমনা হাতটা ছাড়িয়ে উঠে পড়ল আসর ছেড়ে— 'ধুর, ভাল লাগছে না।'

বাইরে এসে বড় করে এক বুক শ্বাস নিল সুমনা। জ্যোৎস্নায় স্নান করছে প্রকৃতি। পাহাড়ের গায়ের আলোগুলো দেখে ঘুম-ঘুম আবেশ বুড়বুড়ি কাটছে মনের ভিতরে। গত দু'দিন টইটই করে ঘোরা হয়েছে লাভার পাইনবনে, খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে মনাস্ট্রি আর মিউজিয়াম। শরীর যেন চলছে না। কাল শিলিগুড়ি পৌঁছেই সোজা রাতের ট্রেনে কলকাতা। বসে বসে হঠাৎই ঘড়ি দেখে চমকে উঠল সুমনা। এরা ডিনার কখন দেবে? প্রায় ন'টা বাজে। একবার জিজ্ঞেস করে আসবে ডাইনিং-এ গিয়ে? মিটমিট করে সোলার পাওয়ারে মাত্র একটা আলো জ্বলছে কটেজের বাইরে। তারপরই আধো অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া রাস্তাটা দেখে গা ছমছম করে উঠল সুমনার। কটেজগুলো ভীষণ ছড়ানো-ছেটানো। এই নির্জনতা কিন্তু সত্যিই বিরল।

ভিতরের ঘর থেকে অবিশ্রান্ত হাসির হররা ভেসে আসছে। সবাই মোটামুটি আউট। সুমনা মাথাটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সামনের লন পেরিয়ে রাস্তা। সোজা খানিকটা উপরে উঠে কিছুটা গেলেই ডাইনিং হল। অর্ডার আগেই দেওয়া আছে। প্লেন রাইস আর মুরগির কারি। সঙ্গে গ্রিন স্যালাড। সায়মদা রুটি খাবে। আরও একবার ওটা রিমাইন্ডার দিতে হবে। চলতে চলতে রাস্তার দু'পাশে সযত্নে লালিত ফুলের বাগান চোখে পড়ল ওর। গাঁদা ফুল ফুটে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ। এত সৌরভ আর একটানা ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই ঘোর লাগা ভাব পেয়ে বসল সুমনাকে। একবার থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে ফিরে দেখল নীল কটেজটা। চাঁদ এখন কটেজের মাথা ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠেছে। হাওয়ার দমকে কোথা থেকে একরাশ মেঘ এসে ঢেকে দিল পাহাড়ের বুকের সব আলো। তাতে আরও রহস্যময় হয়ে উঠল চারপাশ।

মুখ ফিরিয়েই সুমনা দেখতে পেল একতাল অন্ধকার ফুঁড়ে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক ওর সামনে। আঁতকে উঠল সুমনা। ওর ফ্যাকাসে রক্তশূন্য মুখে ভয়ের ছায়া ঘন হয়ে জমাট বেঁধে থমকে গেল। ছায়ামূর্তিটি একটি মেয়ের। তার রুক্ষ চুল মুখের একপাশ ঢেকে রেখেছে। মেয়েটি তার কাজলকালো দৃষ্টি দিয়ে ওর সারা গায়ে আলতো ছোঁয়া বুলিয়ে দিচ্ছিল পালকের মতো। তারপর তার ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠল এক টুকরো হাসি। অনেকদিন পরে কোনও আপনজনের সঙ্গে দেখা হলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

'কতদিন পর তুই এলি!' মূর্তিটা অস্ফুটে বলল ওকে কথাগুলো। সুমনা যেন শুনেও শুনল না। জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল একবার।

'মনে পড়ে আমার কথা? ভুলিস নাই তো?' আবারও জিজ্ঞেস করল সে। উত্তরে ছোট্ট করে ঘাড় নাড়ল সুমনা। মেয়েটি এবার তার বাড়ানো হাত দিয়ে স্পর্শ করল ওর থিরথির করে কাঁপতে থাকা কনুই। ও টের পাচ্ছিল যে, ওর হাতটা অল্প অল্প ঘামছে সেই প্রথম দিনের মতো।

এবার ধীরে ধীরে সেই ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসতে থাকল সুমনার আরও কাছে। কালো ঘোমটার আড়ালে সম্মোহনী ঘোলাটে চোখ। ক্ষয়াটে মুখের কালচে বলিরেখারা কুঁচকে গেল ক্রূর হাসিতে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল সে, 'তোর আজকের রাতটা আমাকে দে না রে। দিবি? শুধু আজকের রাতটা? তোর বরটা কিচ্ছু টের পাবে না।'

না না না, আতঙ্কে শিউরে উঠে ছুটতে শুরু করল সুমনা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। জয়, জয়, সায়মদা, মিলিদি, কোথায় তোমরা? এক ফোঁটাও আর্তনাদ বেরল না ওর গলা চিরে। বাঁধানো শানের উপর ওর চটি বারবার স্লিপ করে যেতে থাকল। কিন্তু কোথায় ওদের কটেজ? এখানেই তো ছিল। পিছনে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই নারীমূর্তি। হাওয়ায় উড়ছে তার আঁচল। সামনে বেবাক শূন্যতা। নীল কটেজটা কোথাও নেই। শুধুমাত্র হা হা করছে অতল খাদের শূন্যতা ভরা পরিত্যক্ত দুই বিঘে। মাথার উপরে আগুনরঙা চাঁদটা জ্বলছে কেবল। সুমনা জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে ফেলতে টের পেল যে, কুলকুল ঘামে জবজবে হয়ে ভিজে গিয়েছে ওর পোশাক। তারপর ঘন আঁধারে হিমে ভেজা মাটিতে পড়ে গেল ওর নিস্পন্দ শরীর।

—এই স্বপ্নটা তুই কবে থেকে দেখছিস সুমি?

—বিয়ের পর থেকে। হানিমুনে গিয়ে বাংলোর বারান্দায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফার্স্ট টাইম দেখেছিলাম। এখন রোজ রাতে দেখি। শুনেছি ওই সময়টায় একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরয় আমার গলা দিয়ে। জয় তো প্রথম দিকে খুব ঘাবড়ে যেত। আমায় ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করে নিজেও অস্থির হয়ে যেত। এখন ওর অনেকটা সয়ে গিয়েছে। মাথার কাছে রাখা জলের বোতল এগিয়ে দেয়, তারপর যন্ত্রের মতো পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। আমারই আর ঘুম আসে না বাকি রাতটা।

মেয়েটা ফিসফিস করে বলে উঠল, 'নাম... ?' তারপর থেমে থেমে বলল, 'দিদিমণি, আমি এই চুয়াপাড়ার চুড়েইল। জন্মেই বাপকে খেয়েছি। মা ওই নামেই ডাকে আমাকে। তুইও ডাকিস।' কথাটা বলেই খিলখিল হাসির তরঙ্গ উঠেছিল ওর শরীর বেয়ে বেয়ে। চটের বস্তাটা খসে পড়ল মুঠো থেকে। হাসতে হাসতেই আমার বাড়ানো হাতটা ধরেছিল ও।

—ডাক্তার দেখাসনি? মানে কোনও ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট? জয় বলেনি?

—বলবে না আবার? আমাদের ম্যারেড লাইফটা একদম তছনছ হয়ে গিয়েছে রে তিতি। সেক্স লাইফ বলে কিচ্ছু নেই। আসলে ইচ্ছে করে না আমার। ঘুমের মধ্যেই নয় কেবল, জয়ের সঙ্গে যখন ইন্টিমেট হই, তখন চোখ বুজলেই মনে হয় ও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝুঁকে দেখছে আমাদের। আর প্রত্যেকবার আমি কুঁকড়ে গিয়ে ছিটকে সরে যাই। জয় ডাক্তার দেখানোর জন্য ভীষণ জোরাজুরি করে। একবার জোর করে নিয়েও গিয়েছিল ড. সান্যালের চেম্বারে। নাথিং চেঞ্জড। খালি একগাদা নার্ভের ওষুধ খেয়ে সারাদিন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমানো। আজকাল তাই আমি হেসে উড়িয়ে দিই। কী হবে? আমি জানি যে এ সারবে না। আমি কাউকে বলি না, তোকে এতদিন পর কাছে পেয়ে ভীষণ ইচ্ছে হল নিজেকে উজাড় করে দিতে।

—বন্ধুকেই তো বলছিস। বল না। কী বলবি?

—বলব ষোলো বছর আগের একটা ঘটনার কথা, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সে দিন মনে পড়ে গেল, যে দিন প্রথম স্বপ্নটা দেখলাম। ওই মেয়েটা এসে আমায় মনে করিয়ে দিল।

—কী হয়েছিল ষোলো বছর আগে? বলবি আমায়? প্লিজ?

—বলব রে। তোকে ছাড়া আর কাকে বলব বল?

একটু থামল সুমনা। তিতির দিকে তাকাল। আবার বলতে শুরু করল জানালার দিকে তাকিয়ে। আবছা আলোয় নিমজ্জিত পশ কফি পার্লারের বড় বড় কাচের জানালার বাইরের কলকাতার ব্যস্ত রাস্তার সন্ধ্যাকালীন শোরগোল দুই বন্ধুকে স্পর্শ করল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলে চলল সুমনা। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল তিতি।

—ঠিক ষোলো বছর আগে আমরা দু'জনেই ছিলাম ষোড়শী। আমি সুমনা রায়চৌধুরী, বালিগঞ্জের কনভেন্ট এডুকেটেড, স্মার্ট, সুন্দরী, বাপির নয়নের মণি, বাপির সঙ্গে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলাম ডুয়ার্সের চুয়াপাড়া টি এস্টেটে দিনকয়েকের জন্য বেড়াতে। বাপির বন্ধু ছিলেন চা-বাগানের ম্যানেজারের খুব কাছের লোক। সেই সময় অমন ছিল না জায়গাটা। ওইসব রিসর্টের জন্মই হয়নি। ভীষণ সুন্দর এবং সাংঘাতিক নির্জন সেই চা-বাগান অঞ্চলের বাসিন্দারা তখন থেকেই ধুঁকছে দারিদ্রের তাড়নায়। বাগানের কাজ প্রায় বন্ধ। স্যালারি নেই। খাবার নেই। কোনও পুঁজি নেই। নিঃস্ব সম্বলহীন অসহায় মানুষগুলো সব। দেখলে কান্না পেত তোর।

বাপি তখন সদ্য সদ্য মায়ের সঙ্গে ডিভোর্সের ক্ষতটা নিতে না পেরে আশ্রয় নিয়েছে ম্যানেজারের পুরনো বাংলোর দক্ষিণের ঘরে হুইস্কির বোতল আর উদাসীনতার আড়ালে। আর আমি ঝাড়া হাত-পা হয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াই এদিক-সেদিক, নদীর ধারে। এক মনে চেটালো পাথরের উপরে বসে তাকিয়ে দেখি, কীভাবে দূরের ওই নীল পাহাড় মিশে যায় মেঘের বুকে আর সন্ধ্যায় হাজার হাজার প্রদীপ জ্বলে ওঠে সেখানে। খুব ভোর থেকে আলোগুলো নিবতে থাকে আবারও জ্বলে ওঠার প্রতীক্ষায়।

তখন আমার ষোলো বছরের মাখনের মতো মসৃণ শরীরটাতেও মাঝে মাঝে দপদপ করে আগুন জ্বলে উঠত। কেউ জানত না সে কথা। বাপিকে তো আর এসব বলা যায় না। একা একাই সেই আঁচে পুড়তাম আমি।

ওকে প্রথম দেখলাম একদিন দুপুর রোদে। মেয়েটার ফিগার দুর্দান্ত। চেহারায় আলগা মাধুর্য আছে। সে দিনও শীতের বেলা। রেইন ট্রিগুলো আলো মেখে ঝকঝক করছে। সেনা ছাউনির দিকে চলে যাওয়া চা-বাগানের ভিতরের রাস্তাটা দিয়ে একটা চটের বস্তা হাতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এলোমেলো হাঁটছিল ও। রুক্ষ চুল। জ্যালজেলে শাড়ির আড়ালে শীর্ণ শরীরটা অপূর্ব লাবণ্যে ভরপুর। হঠাৎ আমি সামনে এসে দাঁড়াতে ও চমকে উঠল।

'কী নাম রে তোর?' জিজ্ঞেস করে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বেশ কয়েকদিন নিজের সঙ্গে কথা বলে বলে হা-ক্লান্ত আমি কিছুদিন ধরেই মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম সমবয়সি মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। তাই খানিকটা গায় পড়েই ভাব জমানোর চেষ্টা।

ও প্রথমটা কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আসলে এসব শহুরে করমর্দনে ওরা অভ্যস্ত নয়। তবে একটু পরেই সহজ হয়ে গেল বেশ। আমার চেহারায় আসলে কোনও নাগরিক চাকচিক্য ছিল না চা-বাগানের দিনগুলোতে। সাধারণ একটা সালোয়ার, না-আঁচড়ানো চুল, প্রসাধনবিহীন রোদে পোড়া তামাটে মুখ— এসব জড়তা ভাঙিয়ে ওকে সহজেই আপন করে নিয়েছিল। হয়ত আমার কলকাতার সেই সনাতন রূপ, চকচকে হাই হিল, ফ্যাশনেবল ড্রেস, পনিটেইল এবং বাদামি আইলাইনারের জৌলুস— এসব দেখলে ও ঘাবড়েই যেত। আমার কাছেই ঘেঁষত না আর।

মেয়েটা ফিসফিস করে বলে উঠল, 'নাম... ?' তারপর থেমে থেমে বলল, 'দিদিমণি, আমি এই চুয়াপাড়ার চুড়েইল। জন্মেই বাপকে খেয়েছি। মা ওই নামেই ডাকে আমাকে। তুইও ডাকিস।' কথাটা বলেই খিলখিল হাসির তরঙ্গ উঠেছিল ওর শরীর বেয়ে বেয়ে। চটের বস্তাটা খসে পড়ল মুঠো থেকে। হাসতে হাসতেই আমার বাড়ানো হাতটা ধরেছিল ও। লক্ষ করলাম যে ওর হাতের তালু ঘামছে। এই শীতেও।

স্টেটাসের আকাশ-পাতাল ফারাক। তবুও বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমাদের। রোজ দেখা করতাম আমরা। ও আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত সবুজ প্রকৃতির মাঝে। ওদের সাদরি ভাষায় শোনাত মিষ্টি সুরে করম পরবের গান। মাঝে মাঝে বলা নেই কওয়া নেই, ধাঁ করে উধাও হয়ে যেত ঘণ্টাখানেকের জন্য। আবার উদয় হত হাসতে হাসতে। হাতে সেই চটের থলি। ও আমায় উপহার দিত পাহাড়ি ফুল। কয়েক গাছা রংচটা চুড়ি। আমি হয়ত আমার আনকোরা লিপস্টিকটা। অথবা না ব্যবহার করা পিঙ্ক স্কার্ফটা।

সেই চটের থলির রহস্যও উদ্ধার হল অবশেষে। বলার জন্য ও নিজেও হাঁকপাঁক করছিল মনে হয়। এলাকার আরও অল্পবয়সি মেয়েদের মতো পেটের দায়ে ওকেও নেমে পড়তে হয়েছে দেহব্যবসায়। রেট ফিক্সড। ঘণ্টায় কুড়ি টাকা। হ্যাঁ, মাত্র কুড়ি টাকা! ওদের কাস্টমার মূলত সেনা ছাউনির জওয়ানরা। এ ছাড়া হাই রোডে গিয়ে দাঁড়ালেও দূরপাল্লার বাসের ড্রাইভার বা খালাসি জুটে যায়। তা ঘর আর কোথায় পাবে বেচারিরা? চা-বাগানের ভিতর খোলা আকাশের নিচে অগত্যা চটের বস্তা পেতে...। কেউ ছুড়ে দশ টাকা দেয়, আবার কেউ কাজ সেরে একটি পয়সা না দিয়ে চম্পট দেয়... বলতে বলতে ঘৃণায় কেঁপে উঠছিল ও।

তবে ঘন কালো বর্ষার মেঘের মাঝেও একদিন খুশির বিদ্যুৎ ঝিলিকের শোভা দেখলাম ওর চোখে। কলকল করে বলছিল ও কত কথা। আজ রাতে দক্ষিণ ব্যারাকের এক তরুণ জওয়ানের কাছে যাবে। আগেও একবার গিয়েছিল তার কাছে। আঙুল দিয়ে আমায় জায়গাটা দেখাল। ওখানে, ওখানেই আজ সন্ধ্যায় এসে দাঁড়াবে ছেলেটা, যাকে মনে মনে ও 'পেয়ার' করে।

আমি ওর হাতটা ধরে বসে ছিলাম অনেকক্ষণ। উত্তেজনায় আমার দেহে শিহরন জাগছিল। কলকাতায় ফিরে গিয়েই আবার হস্টেলের কড়া অনুশাসন। সেই একঘেয়ে গতে বাঁধা জীবন। ওর জন্য সমবেদনার

চাইতেও আমার শরীরে তখন ঈর্ষার জোয়ার। জীবনে যার স্বাদ পাইনি আমি, এই মেয়েটা তা দু'বেলা পাচ্ছে। ইশ্, একটা ঘণ্টার জন্যও ওর লাইফটা যদি আমি পেতাম?

ভয়ংকর শ্বাসরোধী সেই ইচ্ছের প্রচণ্ড তীব্রতা আমি বর্ণনা করতে পারব না। সেটা ছিল এক নিষিদ্ধ অ্যাডভেঞ্চারের প্যাশন। আমি পাগল হয়ে গেলাম। থাকতে না পেরে একটা ভীষণ নিষ্ঠুর খেলা খেললাম ওর সঙ্গে। কী করলাম জানিস? ওর মতো করে শাড়ি পরলাম। মাথায় তেল মেখে চুল বাঁধলাম। হাতে পরলাম সস্তার চুড়ি। ওর বলে দেওয়া জায়গায় আমি পৌঁছে গেলাম ওর আগেই। বিস্মিত ছেলেটাকে এক আঙুলের ইশারায় শরীরের কাছে টানতে আমার লেগেছিল মাত্র কয়েকটা মিনিট।

সেই রাতে জীবনে প্রথমবার একজন সুঠাম পুরুষের দুই বাহুর মধ্যে দলিত ও আবিষ্ট হতে হতে আমি দেখতে পেয়েছিলাম ওকে। দেখছিলাম ওর বিস্ফারিত চাহনি। দূর থেকে ও দেখছিল আমাদের। কিচ্ছু বলেনি, নির্বাক। শুধু একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠেছিল ওর ঠোঁটের পাশে। সে দিন সন্ধে থেকেই আকাশে গোল থালার মতো বিশাল চাঁদ উঠেছিল। কোজাগর। ও ছিল একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে। হাওয়ায় উড়ছিল ওর আঁচল। খানিকক্ষণ পরে ওকে আর সেখানে দেখতে পেলাম না।

পরদিন ভোরে মেয়েটার প্রাণহীন দেহ মিলেছিল জাতীয় সড়কের ধারে। কেন যে গিয়েছিল ও সেখানে। হয়ত অন্য কাস্টমারের খোঁজে। একটা লরি ওর ছিপছিপে শরীরটা পিষে দিয়ে রাস্তায় মিশিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। আমি সেই দৃশ্যটা দেখেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর এল ভয়ানক জ্বর। বাপি আর আমাকে ওখানে রাখতে সাহস পেল না। কলকাতায় ফিরেই নানা রকমের টেস্ট, কড়া কড়া ওষুধ, নার্সিং হোমে অ্যাডমিশন, আমার একটা সেশন নষ্ট— এসবের মাঝে আশ্চর্যজনকভাবে সেই ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম আমি। আসলে আমার অবচেতন মন হয়তো ওই এপিসোডটা ভুলতে চাইছিল পুরোপুরি।

সুমনা এবার ঘুরে তাকাল তিতির দিকে।

—আসলে আমিই চুয়াপাড়ার সেই চুড়েইল। একটা চুড়েইল মরে গিয়ে আরও একটার জন্ম দিয়েছে। ওর হাত থেকে মুক্তি নেই রে আমার। কোনও মুক্তি নেই।

চুপ করে গেল সুমনা। কোনার দিকের ল্যাম্পের হলদেটে আলোটা ওর মুখের একপাশে পড়ছিল। আলো-আঁধারিতে ওর চোখ দুটো জ্বলছিল ধকধক করে। তিতি অপলকে তাকিয়ে রইল ওর বন্ধুর দিকে।

সুমনাকে দেখতে একটা 'চুড়েইল', হ্যাঁ, একটা 'চুড়েইল'-এর মতোই লাগছিল অবিকল।

স্কেচ: সুদত্তা বসু রায়চৌধুরী

সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স

নিরলস নাট্যধারা ও ইন্দ্রায়ুধ

সাতের দশক। নাটকে উত্তাল কোচবিহার। শুরুটা কিন্তু সেই পাঁচের দশকে। তখন সবচেয়ে সক্রিয় ও নামকরা ক্লাব স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব। নাট্যোৎসব, প্রতি সপ্তাহের নাটকে সেরা। উঠে আসছে ছোটরা। সপ্তর্ষি, থিয়েটার ইউনিট, ইন্দ্রায়ুধ ইত্যাদি।

নাট্যদল হিসাবে ইন্দ্রায়ুধ পথ চলা শুরু করে ১৯৭৪ সালের ৮ জুন। ওই দিন কোচবিহার শহরের রাষ্ট্রীয় পরিবহন মঞ্চে রাধারমণ ঘোষ রচিত 'শতাব্দীর পদাবলী' মঞ্চস্থ করে তারা। অঞ্জন রায়, দীপায়ন ভট্টাচার্য, কাজল চন্দ, নির্মাল্য ভট্টাচার্য, উজ্জ্বল সরকার, অপূর্ব ঘোষ, ধ্রুব রায় প্রমুখ কিশোরবাহিনীর হাত ধরেই ডুয়ার্সের নাট্যমঞ্চে গড়ে উঠল এক বুনিয়াদ। উৎসাহদান ও পরিচালনায় ছিলেন নীরজ বিশ্বাস, কানন মজুমদার, শক্তিব্রত রায় ও অমিতেশ দত্ত রায়।

ইন্দ্রায়ুধ-এর ভাবনায় ছিল মানবিক মূল্যবোধ, বিশ্বশান্তি, জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাত-পাত বিরোধী মনোভাব, কুসংস্কার বিরোধিতা, পরিবেশসচেতনতা, দেশপ্রেম ইত্যাদি। মঞ্চ ভাবনা ও প্রয়োগে নিজেদের পরিচয়ে স্বতন্ত্র মাত্রা দিতে যেসব গুণ নাট্যদলের পক্ষে আবশ্যক তা ইন্দ্রায়ুধ-এর ছিল। পাশাপাশি যেসব অঙ্গীকারে দলের ভিত শক্ত হয়, তার সব ক'টির অস্তিত্বই ছিল ইন্দ্রায়ুধ-এ। সে দিনের তৃণাঙ্কুর আজ মহীরুহ। 'শতাব্দীর পদাবলী', 'দামস্ট্রং মূল্যফোস্কার অভিযান', 'একটি কুঁড়ির মৃত্যুতে', 'হচ্ছেটা কী?', 'হয়ত নয়ত', 'বিক্ষুব্ধ', 'সৈকত', 'শূন্য শতকিয়া', 'সারি সারি মৃতদেহ', 'মহেশ', 'যদি আমি কিন্তু আমি', 'স্ফিংক্স', 'নোপাসারণ', 'সেনা সৈন্য সৈনিক', 'আজও ইতিহাস'— ইন্দ্রায়ুধ-এর প্রযোজনা তালিকাও বেশ লম্বা। এর মধ্যে অবশ্যই উল্লেখের দাবিদার 'এল সালভাদোর'। উল্লেখ করতে হয়, পরিবেশ বিষয়ক প্রযোজনা 'অদ্ভুতং'-এরও, যেটি ইতিমধ্যে পঁচানব্বইবার মঞ্চস্থ হয়েছে। ইন্দ্রায়ুধ-এর সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা 'নৌকোটা আমাদের'।

ইন্দ্রায়ুধ নাটকের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংস্থাও বটে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন, বর্ষবরণ, সফদার হাসমি স্মরণ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন, রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন— সবই এখনও ধরে রেখেছে তারা। সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ইন্দ্রায়ুধ চল্লিশ পেরিয়েও তাদের গতি অব্যাহত রেখেছে।

অনেকবার ভিন রাজ্যের নাট্যপিপাসুদের আমন্ত্রণে আসাম, নাগাল্যান্ড, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যে নাটক পরিবেশন করে প্রশংসাও কুড়িয়েছে। প্রায় প্রতি বছর তাদের আয়োজিত নাট্য উৎসবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নাট্যদলের পাশাপাশি হাজির হয়েছে কলকাতারও বহু দল।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

ভুটান ও হিমালয় বঙ্গ নিয়ে চর্চা

জয়গাঁ ননী ভট্টাচার্য মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা রত্না পাল এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আনন্দগোপাল ঘোষের

যুগলবন্দিতে প্রকাশিত গ্রন্থটি বিদগ্ধদের নজর কাড়বেই। ভুটান ও হিমালয় বঙ্গ নিয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ বা বিদ্যায়তনিক প্রবন্ধের সংখ্যা খুব কম। ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী দেশটি নিয়ে আগ্রহ কিন্তু অসীম। বন্ধু রাষ্ট্রটি নিয়ে এই চর্চা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। ড. ঘোষের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, 'ভুটানের রাষ্ট্রভাষা জঙ্খা। এটি তিব্বতী ভাষার একটি উপভাষা। ভুটানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ড্রুকপা গোষ্ঠীর লোকেরা এই ভাষাতেই কথা বলেন। এটি রাষ্ট্রীয় ভাষা হলেও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ— সব স্তরের শিক্ষার মাধ্যমই হল ইংরেজি। জঙ্খা ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো হয়। জঙ্খা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার উঁচুমানের নয়। তাই ভুটান রাজ্য সরকার জঙ্খা ভাষায় উন্নয়নের জন্য জঙ্খা ভাষা কমিশন গঠন করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের এই ভাষা লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।' বইটি জুড়ে অসংখ্য তথ্য। ভুটান থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার নাম 'কুয়েনসেল'; ভুটানি এই পত্রিকার কোনও সংবাদদাতা নেই, 'দেশের অভ্যন্তরের খবর রাজার সচিবালয় থেকে সংগৃহীত হয়। আর সার্ক দেশগুলির খবর সার্ক সংবাদ দপ্তর থেকে আসে।' বইটিতে আলোচিত হয়েছে— ভুটানের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ও তার বর্তমান অবস্থা, ভুটানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রসারে ফাদার উইলিয়াম ম্যাকের ভূমিকা এবং বংশানুক্রমিক রাজাদের ভূমিকা, ভুটানে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার চর্চা। ভুটানের পাশাপাশি ডুয়ার্স অনেকটা জুড়ে আছে এ বইয়ের। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটের ডুয়ার্সের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। রয়েছে নেপালি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। হিমালয় বঙ্গের অধিবাসীদের চিন্তনে মননে লিখনে যাপনে হিমালয়ের প্রভাব নিয়ে সুন্দর আলোকপাত করেছেন ড. ঘোষ।

ভুটান ও হিমালয় বঙ্গ ঃ প্রসঙ্গ শিক্ষা, সমাজ। সংস্কৃতি, রত্না পাল, আনন্দ গোপাল ঘোষ, এন এল পাবলিশার্স, শিবমন্দির, মূল্য ২০০

সৃজন বিশ্বাস

সত্যিই অপরাজেয় উত্তর-পূর্ব!

সামাজিক ইতিহাস রচনার উপাদান প্রধানত আসে আঞ্চলিক ইতিহাস থেকে। বাংলায় বসে বাংলারই পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির ইতিহাস, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক চাপানউতোরের সুলুকসন্ধান খুব একটা সহজলভ্য নয়। সেই অপূর্ণতা থেকেই এক শ্রেণির 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' মানুষ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পর্যটনকেন্দ্রগুলির চিরুনিতল্লাশি চালিয়ে এসেছেন। যদিও বাংলায় খ্যাতিবিহীন আসাম, মিজোরাম, মায়ানমারের আঁচল-ছোঁয়া দুর্লভ কিছু পর্যটনকেন্দ্র তেমন গুরুত্ব পায় না পর্যটকদের আঙিনায়। তার চেয়ে বরং আয়েশ করে দার্জিলিং পৌঁছে টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে সেল্‌ফি তুলে ফেসবুকে আপলোড করা অনেক সহজ। তাঁদের মতে, আমাদের কি বোর্ড এগজাম, যে আমাদের পাশের রাজ্যের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান জানতে হবে?

তারই মধ্যে এক ব্যতিক্রম গৌরীশংকর ভট্টাচার্যর 'নর্থ ইস্ট নট আউট' বইটি। বইটির একটি গালভরা নামকরণও করেছেন রংরুট-এর প্রকাশক, 'চরৈবেতি'।

অরুণাচলের জলপ্রপাতকে ব্যাকগ্রাউন্ড করে 'কোয়লা' সিনেমায় নৃত্যরত মাধুরী দীক্ষিতের নৃত্যশৈলী এবং নিসর্গকেও হার মানায় মিয়াওঁ। শিরীষ, সেগুন, অর্জুন, হলক, মেকাও গাছের সারি ঘিরে আছে মিয়াওঁকে। চিড়িয়াখানায় দর্শনীয় হোয়াইট উইং উড ডাক এক বিপন্ন পাখির কৃত্রিম প্রজন্ম। মিয়াওঁ থেকে ডেবান ২৪ কিমি পথ। যাত্রাপথে দেখা মেলে বনের ভিতরে মাচার মতো ঘরবাড়ি করে বসবাস করছে চাকমা উপজাতির মানুষজন। সভ্য জগতের খোঁজখবর এরা রাখে না। অবাক চোখে তাই চেয়ে থাকে নবাগত পর্যটকদের দিকে। বর্ষায় ভয়ংকর জোঁকের উৎপাত। আমাদের লাভার মতো। তবে শীতে নাকি জোঁক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। শীতকালে তারা কি হাইবারনেশনে যায়? লেখক সে কথা জানাননি। তাই প্রশ্নটা থেকেই যায়।

বুদ্ধদেব গুহর 'বাবলি' পড়েননি এমন বাঙালি পাঠক কমই আছেন। বাবলির মতো লেখকও ইম্ফলের লোকতাক লেকে পৌঁছে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। পর্যটকদের কাছে লোকতাকের সৌন্দর্য আকর্ষণীয় হলেও জেলেদের তা একমাত্র রুজিরোজগারের ভাণ্ডার। পৃথিবী জুড়ে এর প্রসিদ্ধি আর একটি কারণে, সেটি হল এর ভাসমান উদ্যান।

ভারতের প্রথম অরুণোদয়ের যে দেশ, তার নামকরণ করেন বহুভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়— অরুণাচল। এই অরুণাচলেরই নামপং ভারতের শেষ গ্রাম। সেই গ্রামের কিছুটা এগিয়ে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাকদণ্ডী পথে মায়ানমারের পাংসাউ বাজার ঘুরে দেখা যায়। যেমন আমাদের জয়গাঁও থেকে ফুন্টশিলিং। কিন্তু অফিশিয়াল কী কী ডকুমেন্টস লাগে বা আদৌ লাগে কি না, সে

কথার উল্লেখ নেই। পাংসাউ পাস, নামপঙের মাঠে শীতকালীন উৎসবে যোগদান, সমগ্র অঞ্চলের বর্ণময় চিত্র, জনজাতিদের সমাজ প্রত্যক্ষ করা লেখকের জীবনে সেরা অভিজ্ঞতাপ্রাপ্তি বলে স্বীকার করেন।

বইতে কোথায় থাকবেন, কীভাবে যাবেন, খরচখরচা, এমনকি সমস্ত জায়গার দূরভাষ নম্বর পর্যন্ত বিস্তারিত জানানো হয়েছে। এমন টুরিস্ট গাইড সঙ্গে থাকলে নির্দ্বিধায় রেডি-স্টেডি-গো বলে বেরিয়ে পড়া যেতে পারে। রঙিন ছবি, চমৎকার ছাপা, শক্তপোক্ত বাঁধাই, আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

নর্থ ইস্ট নট আউট। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। রংরুট হলিডেইয়ার। মূল্য ১৫০ টাকা।

ব্রততী ঘোষ

অরণ্য মিত্র

চিনা স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস যা পুলিশ-সেনা-গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে কাজ করে তার ডিলটা সেরে ফেলার কথা পাকা করেন দাসবাবু। কিন্তু আচমকা ফোন পেয়ে মিজোরাম সফর বাতিল করে তাকে পৌঁছতে হয় কলকাতায় বুদ্ধ ব্যানার্জির ডেরায়। সেখানে বানচাল হয় ডিভাইসের ডিল। বদলে নীলছবি বানিয়ে দুবাই-কানাডা পাঠানোর প্ল্যান ছকা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী বানারহাটের এক হোটেলে বিরজুপ্রসাদ মুনমুন টোপ্পোর সঙ্গে নীলছবির জন্য ভরপুর শরীরী আবেদন আছে এমন মেয়েদের জোগান নিয়ে কথা বলেন। ব্লো জব, হ্যান্ড জব, মাসাজ রুম থেকে শুরু করে ডুয়ার্সের কোথায় কীভাবে খোলাখুলি সিনের শুটিং হবে সে সবও বিস্তারিত কথা হয়। ডুয়ার্সের আনাচ-কানাচে গোপন এরকম বহু রোমহর্ষক ঘটনা উঠে আসছে ধারাবাহিকটির প্রতিটি পর্বে।

১৬

এখন সকাল সাড়ে আটটা। বীণাদি যখন-তখন চলে আসবেন। বীণাদির হাসিখুশি মুখটা বেশ লাগে রুপালি মুন্ডার। পাঁচ বছর বয়সে রুপালি তার মা-বাবার মৃতদেহ দেখেছিল। চা-বাগানের লেবার ছিল তার পরিবার। বাগান থমকে যাওয়ায় বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল দিন দিন। লড়াই চালাতে না পেরে চলন্ত ট্রেনের সামনে লাফ দেয় একদিন। লাফ দেওয়ার আগে দুই দাদা সমেত রুপালিকেও টেনে নিতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু দাদারা ছিটকে পড়েছিল লাইনের বাইরে আর রুপালির হাতটা মা ঠিকমতো ধরতেই পারেনি। তিন ভাইবোন কয়েক মাস অনাথ হয়ে যখন প্রায় মরতে বসেছে, তখন একদিন কে জানি এসে নিয়ে যায় দাদাদের। বলেছিল শিলিগুড়িতে কাজ দেবে। তারপর দাদাদের আর দেখেনি রুপালি। সেও হয়ত গায়েব হয়ে যেত এর পরে দাদাদেরই মতো একদিন, কিন্তু মাইকেল মুন্ডা তাকে নিয়ে আসে আলিপুরদুয়ারে। সে গ্যারেজে কাজ করত, আর তার কেউ ছিল না। রুপালিকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখার পর দিয়ে আসে সতু বিশ্বাসের কাছে। স্কুল মাস্টার সতু বিশ্বাস আসলে কাজের লোক খুঁজছিলেন। রুপালিকে তাঁদের বেশ পছন্দ হয়। এর পর আট বছর হল রুপালি সতু বিশ্বাসের বাড়িতেই আছে।

মাসখানেক হল বীণাদির সঙ্গে আলাপ রুপালির। সতু আঙ্কলের জন্য বিড়ি আনতে যাচ্ছিল সে। বাড়ি থেকে বার হতেই গেটের সামনে দু'জন মহিলাকে দেখে। ওরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়েদের খবর নিয়ে খাতায় লিখে রাখে। ওরা আন্টির সঙ্গে কথা বলেছিল বেশ খানিকক্ষণ। সেই থেকেই আলাপ। ওই দু'জনের একজন বীণাদি। এর পর তিন-চার দিন দেখা হয়েছে বীণাদির সঙ্গে। প্রায় দিন সন্ধের একটু আগে মোড়ের দোকান থেকে জিলিপি আর চপ আনতে যায় রুপালি। আঙ্কলের প্রিয় খাবার। সেই দোকানের কাছেই বীণাদিকে পেয়েছিল তিন-চারবার। জলপাইগুড়িতে নাকি আদিবাসীদের জন্য বিশেষ কী একটা ব্যবস্থা আছে। কাজ-টাজ শেখায়। টাকাও দেয়। রুপালি সেলাই জানে একটু একটু। আন্টির কাছ থেকে শেখা। আন্টির মেয়ে রিঙ্কুদিও ভাল সেলাই করে আর ছবি আঁকে।

রুপালি বলেছিল যে সে সেলাই শিখতে চায়। কন্যাসাথি নামের একটা দলের সঙ্গে বীণাদি যুক্ত। তার অফিস ধূপগুড়ির কাছে কাশিয়াগুড়িতে। প্রথমে সেখানে কয়েক মাস সপ্তাহে দু'দিন করে ট্রেনিং নিতে যেতে হবে। দু'ঘণ্টার ট্রেনিং। সেখান থেকে পাশ করলে ভরতি হতে পারবে জলপাইগুড়িতে। সেখানে হস্টেল আর খাওয়া ফ্রি। সরকার থেকে মাসে মাসে টাকা পাবে। পাশ করে বার হতে পারলে লোনের ব্যবস্থা করে দেবে। রুপালি কথাটা বলেছে আঙ্কলকে। সতু বিশ্বাস সেটা জানার পর উৎসাহ দিয়েছে। রিঙ্কুদিও বলেছে সেলাইয়ের কোর্সটা করে ফেলতে। তারপর এখানে একটা লেডিজ টেলারিং শপ খুলে ফেলতে পারবে রুপালি। শেষ যে দিন বীণাদির সঙ্গে দেখা হল, তখন রুপালি বলেছিল তাদের বাড়িতে আসতে।

যদিও রিঙ্কুদির মা-বাবা তার কেউ নয়, কিন্তু বাড়িটাকে নিজের বলেই ভাবে রুপালি।

বীণাদি বলেছিলেন কয়েক দিনের মধ্যেই আসবেন। তারপর প্রায় এক সপ্তাহ চলে গিয়েছে। রুপালি ভাবছিল, এই বুঝি এল বীণাদি। কাল দুপুরে সে নিশ্চিত হয়েছে যে আজ সকালে আসবে। আজ রবিবার। সকাল সকাল এসে আঙ্কলের সঙ্গে কথা বলে যেতে

রাজা রায়ের পাঠানো লোকের সঙ্গে কথা বলে মনে বেশ ফুর্তি এসেছিল দাসবাবুর। সঙ্গে একটা চিনাও ছিল। অবশ্য সে কাগজে-কলমে নেপালের নাগরিক। মোটামুটি হিন্দি জানে। দাসবাবু কথা বলে বুঝলেন যে, চিন থেকে যোগাযোগের জন্য যে ডিভাইসের প্রস্তাব নিয়ে দু'জন এসেছে, তা মূলত একটা চিনা স্যাটেলাইট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চিনা সরকার আড়ালে থাকবে জেনে নিশ্চিত হলেন দাসবাবু। ডিল পাকা হলে সময় লাগবে এক মাসেরও কম।

পারবে বীণাদি।

পৌনে ন'টা নাগাদ 'কন্যাসাথি' লেখা একটা বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। চারশো সাত মার্কা ছোট বাসের চেহারার গাড়ি। সতু বিশ্বাস বারান্দায় রোদ্দুরে বসে মোবাইলে ফেসবুক করছিলেন। গাড়িটা দেখে বুঝলেন যে 'কন্যাসাথি' এনজিও মোটেই এলেবেলে ব্যাপার নয়। তিনি দেখলেন দু'জন মহিলা গেট খুলে ভিতরে আসছেন। বীণাদির গল্প শুনলেও তাঁকে তিনি চেনেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রুপালির ব্যাপারে আসছেন কি?'

—একদম দাদা! আমিই বীণাদি। আর ইনি হলেন কাশিয়াগুড়ি ব্রাঞ্চের ইনচার্জ লাবনি দাস।

—আসুন আসুন।

রুপালি ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে। বীণাদি তার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে হেসে বললেন, 'এই দিদিকে প্রণাম কর। ইনি হলেন লাবনিদি। এই দিদিই যা করার করবে।'

রুপালি খুশিতে ডগমগ হয়ে প্রণাম করল। লাবনিদি কিছু বললেন না। ওদের ঘরে বসিয়ে সতু বিশ্বাস রুপালিকে ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন চা-খাবার আনার জন্য। তারপর দু'জনের মুখোমুখি বসে বললেন, 'আমি নেট সার্চ করে কন্যাসাথি দেখে নিয়েছি। অনেক মেয়েকে সেফ জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন দেখলাম।'

—রুপালির ব্যাপারে তেমন কোনও সমস্যা হবে না। বললেন লাবনি দাস। 'ওর তো পেরেন্ট ডেড হয়ে গিয়েছে। বয়সে এখনও মাইনর। এমন আদিবাসী মেয়েদের জন্য জলপাইগুড়িতে ট্রেনিং আর হস্টেলে কোনও প্রবলেম হবে না। তার আগে কয়েক মাস আমার সেন্টারে ট্রেনিং নেবে।'

সতু বিশ্বাস বললেন, 'খুব ভাল হয় ম্যাডাম। এমনিতে আমরা ওকে বাড়ির মেয়েই ভাবি। একটু একটু পড়তে-লিখতেও শিখিয়েছি।'

—মানুষের মতো কাজ করেছেন দাদা! ডুয়ার্সে এইসব মেয়েরা কী পরিমাণে হিউমিলিয়েটেড তা তো আমরা দেখছি। সার্ভে করতে গিয়ে অনেক সময় চোখে জল চলে আসে।

লাবনি দাসের কথায় সতু বিশ্বাস মাথা নাড়লেন। 'ফর্ম-টর্ম কিছু সই করতে হবে নাকি?'

—জাস্ট একটা অথরাইজেশন লেটার। তবে সেটা জলপাইগুড়িতে ট্রেনিং-এ যাওয়ার আগে পেলেই হবে। আমাদের সেন্টারে অল্প কিছু ফর্ম্যালিটি আছে। সেসব আমরাই করে দেব।

রুপালি পাশের ঘরে চা আর খাবারের প্লেট সাজাতে সাজাতে সব শুনছিল। পাশে রিঙ্কুদি। সে একটু হেসে বলল, 'রেডি হ। আলিপুর থেকে ধূপগুড়ি একা একা যেতে-আসতে পারবি তো?'

রুপালি উত্তরে যে হাসিটা দিল, সেটা দেখে বোঝা গেল যে, যাতায়াতটা তার কাছে কোনও সমস্যাই নয়।

১৭

রাজা রায়ের পাঠানো লোকের সঙ্গে কথা বলে মনে বেশ ফুর্তি এসেছিল দাসবাবুর। সঙ্গে একটা চিনাও ছিল। অবশ্য সে কাগজে-কলমে নেপালের নাগরিক। মোটামুটি হিন্দি জানে। দাসবাবু কথা বলে বুঝলেন যে, চিন থেকে যোগাযোগের জন্য যে ডিভাইসের প্রস্তাব নিয়ে দু'জন এসেছে, তা মূলত একটা চিনা স্যাটেলাইট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চিনা সরকার আড়ালে থাকবে জেনে নিশ্চিত হলেন দাসবাবু। ডিল পাকা হলে সময় লাগবে এক মাসেরও কম। দাসবাবুর হাতে আসবে একশোটা মোবাইল ফোনের মতো ডিভাইস। প্রতিটা সেটের আলাদা নম্বর। গোটা পৃথিবীর জলে-স্থলে-জঙ্গলে কাজ করবে ডিভাইসগুলি। পুলিশ-সেনা-গোয়েন্দা আড়ি পাতা তো দূর অস্ত, টেরই পাবে না।

দাসবাবু ডিলটা এক মাসের মধ্যে সেরে ফেলবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠিক করেছিলেন, পরদিন সকাল সকাল রওনা দেবেন মিজোরামের দিকে। সেখানে গোবাসুরি বলে একটা ছোট্ট জায়গা আছে পাহাড়ের কোলে। ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের মিলনবিন্দু তিনমুখী পিলার সেখান থেকে কাছে। চট্টগ্রাম বন্দরও তেমন দূরে নয়। গোবাসুরি আর তার আশপাশের এলাকাটা দাসবাবুর বেশ প্রিয়। চিন থেকে যেসব প্রস্তাব আসে, তা ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য জায়গাটা আদর্শ। এই কাজটা বর্মা থেকে আসা জঙ্গিদের সঙ্গে কথা বলে করেন দাসবাবু। পরিকল্পনা মতো হোটেল থেকে সকাল ছ'টা নাগাদ বেরিয়েও পড়েছিলেন নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের দিকে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগেই বুদ্ধ ব্যানার্জির ডান হাত আশিস ঢালির ফোন এল।

—দাদা জানতে চাইছেন আজ কলকাতায় আসা সম্ভব কি না।

আশিস ঢালির শান্ত স্বর শুনে মুহূর্তের মধ্যে মিজোরাম সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন দাসবাবু। গাড়ি ভাড়া করে সোজা বাগডোগরায় চলে আসেন। সন্ধে ছ'টা নাগাদ তিনি লেনিন সরণিতে বুদ্ধ ব্যানার্জির গোপন ফ্ল্যাটে এলেন একটা হালকা জ্যাকেট গায়ে দিয়ে। জ্যাকেটের দু'পাশের দুটো পকেটে হাজার টাকার দু'খানা বান্ডিল। খুব জরুরি ব্যাপার না হলে বুদ্ধ ব্যানার্জি ডেকে পাঠান না। পকেটের টাকাটা ভেট হিসেবে নিয়ে এসেছে দাসবাবু। ন'মাসে-ছ'মাসে একবার দর্শন হয়। ভেট পেলে সম্রাটের মন খুশি থাকে।

দেড় হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাটটা অবশ্য সাধারণ। কয়েকটা আসবাব ছাড়া কিছু নেই। বুদ্ধ ব্যানার্জি একটা সিঙ্গল বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চুরুট টানছিলেন। সামনে একটা অ্যাশট্রে আর মোবাইলের দুটো এলেবেলে সেট। মাথায় পাতলা হয়ে আসা সাদা চুল। টকটকে ফরসা। হাইট সাড়ে পাঁচ। এক ঝলক দেখলে বাংলা সিনেমার বয়স হয়ে যাওয়া নায়কের কথা মনে পড়ে। মেরুন সাদা ডোরা দেওয়া পাজামা আর গায়ে জড়ানো কাশ্মীরি মহার্ঘ শাল। তার রংও মেরুন।

—এসো হে দাস! বুদ্ধ ব্যানার্জি মৃদু হেসে আপ্যায়ন করলেন। দাসবাবু নমস্কার জানিয়ে পকেট থেকে বান্ডিল দুটো বার করে পাশাপাশি সাজিয়ে দিল বিছানার উপর। বুদ্ধ ব্যানার্জি পাশ থেকে একটা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে ফেলে দিলেন বান্ডিল দুটোর উপর। টাকা ঢাকা পড়ল সংবাদে।

—আলিপুরদুয়ারে কী করছিলে?

বুদ্ধ ব্যানার্জির কাছে কিছু লুকোলে ধরা পড়ে যাবে জেনে দাসবাবু বললেন, 'একটা প্রাইভেট নেটওয়ার্কের ব্যাপারে কথা বলার ছিল।'

—চায়নার স্যাটেলাইট ফোন তো? ভাল। ডিল করলে?

—নেক্সট মান্থে।

—গুড। মিষ্টি গন্ধের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বুদ্ধ ব্যানার্জি বললেন, 'এসব মোবাইল আর ইন্টারনেট খুব রিস্কি, বুঝলে দাস? বোসো!'

দাসবাবু এবার একটা চেয়ারে বসলেন।

বুদ্ধ ব্যানার্জি কেন ডেকে আনিয়েছে, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর বুদ্ধ ব্যানার্জি একটু নড়েচড়ে শালটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে সরাসরি দাসবাবুর দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় উচ্চারণ করলেন, 'কাশিয়াগুড়ির কেসটা নিয়ে একজনের সোশাল সার্ভিস দেওয়ার শখ হয়েছে তা জানো?'

—মানে? দাসবাবু ঠিক ধরতে পারলেন না।

—একজন এক্স-পুলিশম্যান। ধূপগুড়ি থাকে। কনক দত্ত।

—সে কী করছে দাদা?

—কাশিয়াগুড়ির ছেলেটাকে যোগাযোগ করে কে এনেছিল দাস?

—নামটা মনে নেই। তবে পেয়ে যাব।

—তার মোবাইল নাম্বারের পাত্তা লাগানো হয়েছে জলপাইগুড়ি থানা থেকে। ধূপগুড়ি থানায় একটা মাল দত্তের কথায় নাচছিল। ওকে জলপাইগুড়ি ট্রাফিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দত্ত ওটাকে দিয়েই ফোন কলের খুঁটিনাটি বার করেছে।

—ফোনটা দাদা ছেলেটার নামে ছিল না।

—যার নামে ছিল, সে ঠাকুর বানায়। তার নিজের কোনও সেট নেই। একই গ্রামে বাড়ি। এর পর ছেলেটাকে পেতে দত্তর কতক্ষণ লাগবে দাস?

দাসবাবুর একটু গরম লাগতে শুরু করল। জ্যাকেটের চেনটা খানিকটা নামিয়ে তিনি বললেন, 'সরি দাদা। স্টেপ নিচ্ছি।'

বুদ্ধ ব্যানার্জি খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। দাসবাবু মোবাইল বার করে নাম্বার ধরলেন একটা। ওপাশের গলা পেতেই বললেন, 'কাশিয়াগুড়ির কেসটায় কাকে চার বানিয়েছিলি?'

—ছেলেটার নাম জগন। সোনাপুরের কাছে বাড়ি। আলিপুরদুয়ার রোডে।

—অফ করে দে।

—পুরা?

—একদম।

মোবাইল পকেটে রেখে দু'হাতে মুখ মুছলেন দাসবাবু, 'কিন্তু এই ব্যাপারটার জন্য তাঁকে কলকাতায় ডাকার কোনও অর্থ নেই। বুদ্ধ ব্যানার্জির মতলব কী?'

—তোমাকে আসলে একজনের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করাব বলে ডেকেছি দাস। এখুনি ইন করবে।

—কে দাদা?

বুদ্ধ ব্যানার্জি জবাব দিলেন না। আবার শরীরটা এলিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'ভিডিয়োর ব্যবসায় ঢুকে যাও দাস। ঝামেলা কম। ইনভেস্ট কম। বিরাট বাজার।'

—সিনেমার কথা বলছেন দাদা?

—সিনেমা তো বটেই। বুদ্ধ ব্যানার্জি যেন মজা পেয়েছেন এমনভাবে বললেন। চুরুটে লম্বা কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিলেন চারপাশ। তারপর একটু ঝুঁকে দাসবাবুর চোখে চোখ রেখে মিষ্টি গলায় বললেন, 'দুবাই আর কানাডায় কিছু নীল সিনেমা বানিয়ে পাঠাতে হবে দাস। সিনেমারও কিছু দুষ্টুমিষ্টি মেয়ে তাতে থাকবে।'

কেউ একজন ঘরে এল। দাসবাবু দেখলেন সুঠাম চেহারার এক যুবক। সে বুদ্ধ ব্যানার্জিকে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে দাসবাবুর দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাল।

—আলাপ করো দাস। নবীন রাই ফ্রম নেপাল।'

১৮

সস্তার হোটেলের ঘরের জানালা দিয়ে রোদ্দুরের ফালি এসে পড়েছে নীল-সবুজ ফুলকাটা বিছানার চাদরে। ফালির একদিকে বিজু প্রসাদ, আরেক দিকে মুনমুন টোপ্পো। দরজার একটা পাল্লা খোলা। বাইরে বানারহাট বাস স্ট্যান্ডের কলরব ভালই শোনা যায় এ ঘরে বসে। একটু আগে হোটেলের কর্মচারী একটা নরম পানীয়র বোতল দিয়ে গিয়েছে মুনমুনের জন্য।

প্রায় কুড়ি মিনিট হল এসেছে মুনমুন টোপ্পো। কাজের কথা এখনও শুরু করেনি বিজু প্রসাদ। তাঁকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল। মনে হয়, তিনি মনে মনে তাঁর বক্তব্য গুছিয়ে নিচ্ছিলেন।

—বোসবাবু রিটায়ার করলেন আর সেই জায়গায় দাসবাবু এলেন। অবশেষে শুরু করলেন তিনি, 'আখুন অনেক আইডিয়া এসে গিয়েছে। এর মধ্যে জরুরি, হল নাঙ্গা পিকচারের ভিডিয়ো বানাতে হবে।'

—সেখানে আমি কী করব বিজুজি? এক চুমুক পানীয় গিলে মুনমুন ঠান্ডা স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'মালিকের সঙ্গে আমার লাগানোর ভিডিয়ো হোয়াটসঅ্যাপ করে দেব?'

—আরে না! বিজু প্রসাদ আরও শান্ত স্বরে বললেন কথাটা। 'লড়কি সাপ্লাই দিবে। ভিডিয়োর জোন্য স্পেশাল টার্গেট কোরবে। খেতে পায়, পোড়াসুনা ভি করে, অউর সেক্সি ভি আছে এমন লড়কি তুলে নিবে।'

মুনমুন টোপ্পো চুপ করে থাকে। বিজু প্রসাদের বক্তব্য সে বুঝতে পেরেছে। সুরাটে মালিক আর তাঁর দু'-একটা দোস্তের শরীরের বিভিন্ন অংশে কীভাবে মর্দন, লেহন, চোষণ করতে হবে, তা রপ্ত করার জন্য তাকে রকমারি পর্ন ভিডিয়ো দেখানো হয়েছে। পেল্লায় এলইডি মনিটরে সেসব চকচকে ছবি দেখে মুনমুন জেনে গিয়েছে যে, তার দেশ প্রচুর এগিয়ে গিয়েছে এইসব বানাতে। 'ব্লো জব', 'হ্যান্ড জব', 'মাসাজ রুম'— এই শব্দগুলোর অর্থ জেনে গিয়েছে মুনমুন। তার এই অভিজ্ঞতার কথা বিজু প্রসাদ বোধহয় জানে। অবশ্য জানলেও মুনমুনের কোনও অস্বস্তি নেই। এই জগৎটায় সবাই সবারটা জানে। কেউ কিছু মনে করে না।

আরেক চুমুক পানীয় নিয়ে মুনমুন বলল, 'টাউন এলাকাগুলোয় মেয়ে পেতে অসুবিধা হবে না। বাবুদের মেয়ে সব। ভাল দেখতে। চেহারাও ভাল। শুটিং কোথায় হবে?'

—আরে, ডুয়ার্সের কোথাও কোরে নিবো। কাছাকাছি শুটিং হোলে লোকাল মেয়েরা রিস্ক নিবে। দূরে যাবে কেন?

বিজু প্রসাদ বোঝাতে পেরে উঠে দাঁড়ায়। কোমরে দু'হাত রেখে মুনমুনের দিকে তাকিয়ে সরু চোখে বলে, 'তুমিও হিরোইন বন যাও মুনমুন। কালার তোমার ব্ল্যাক আছে, লেকিন ফিগার নাইস আছে।'

—তা আছে। মুনমুন বোতলটা খালি করে মেঝেতে নামিয়ে রাখে। 'তবে ক্যামেরার সামনে ওসব করার আমার কোনও ইচ্ছে নেই।'

বিজু প্রসাদ কিছু বললেন না।

—সুষমার খবর কী?

—আরে, খুব ভাল কাজ কোরে দিল সুষমা। বিজু প্রসাদ আবার বসে পড়ে রোদ্দুরের ওপারে। 'ডিটেল বোলবো না। তবে কাজ কোরে আখুন ও কালিম্পং এনজয় করতে গিয়েছে সুনলাম।'

মুনমুন জানে যে সুষমার ব্যাপারে আর বেশি কিছু বলবে না বিজু প্রসাদ। তবে একটু আগে যে কাজের কথা হল, তা করতে হলে সুরাটের মালিককে ছাড়তে হবে তাকে। অবশ্য তাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে নতুন মেয়ে দিয়ে দেবে সে। মালিকের সঙ্গে কথা বলার কাজটা করে দেবে বিজু প্রসাদের লোক।

—ভিডিয়োর কাজের জন্য তো সুরাটে থাকলে চলবে না বিজুজি! কথাটা এবার বলল মুনমুন টোপ্পো। বিজু প্রসাদের মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'সে তো চোলবেই না। লড়কি চালানের বেপারে তুমি এখন এক্সপার্ট বনে গিয়েছ। মালিকের সঙ্গে শুয়ে টাইম নোস্টো কোরলে চোলবে না মুনমুন। ক্যারিয়ার বনাও আখুন।'

—তখন ডুয়ার্সে কোথায় থাকব আমি?

—হোবে হোবে। বিজু প্রসাদ অভয়দানের কণ্ঠে বলল কথাটা। 'এই লটের মাল এক্সপোর্ট কোরিয়ে দাও। তুমার পাপ্পড় কোম্পানির মালিকের জন্য একটা, কী যেন বোলে, মুচমুচে পিস ভেজে দিয়ে কোথা বোলে নিবো, ব্যাস!'

বিজু প্রসাদের এই ভঙ্গিটি মুনমুনের চেনা। এর মানে হল, কাজটা বিজুজি করবেই।

মুনমুনের মনে হল, বাড়িটা সে তাড়াতাড়িই বানিয়ে ফেলতে পারবে।

(ক্রমশ)

এবার হোলিতে বন্ধ চা-বাগিচায় ফাগুনের রং নেই

ডুয়ার্স দিগন্তে লেগেছে বসন্তের ছোঁয়া। রঙের উৎসবও কড়া নাড়ছে দরজায়। তবে এবার ডুয়ার্সে ফাগুয়ার রং নেই বন্ধ চা-বাগানে। ভাত-রুটি জোটাতেই হিমশিম খাচ্ছেন মানুষ। কীভাবে হবে সেখানে খুশির হোলি, কোথা থেকে মিলবে পিচকারির রং? অনাহারে অর্ধাহারে থাকা শ্রমিক খুঁজছে কাজ। মেয়েরাও পেটের জ্বালায় ঘর থেকে রাস্তায় নেমেছে। শহরের নিষিদ্ধ গলিতেও যাতায়াত করছে কেউ কেউ। স্বেচ্ছায় পাচার হচ্ছে ভিন রাজ্যে। শুধু তো নিজের পেট নয়, ঘরে আরও যারা আছে তাদের মুখ চেয়েই চা-বাগান থেকে গুটি গুটি পা বাড়াতে হচ্ছে অজানা অন্ধকারে। সামনে খোলা নেই অন্য কোনও পথ। পেট যে কোনও নিষেধই মানে না। বন্ধ চা-বাগানেও আলো নেই। পেট ভরানো খাবারের জন্য যে রাস্তা সেখানেও জমাট অন্ধকার। যদি বা দু'মুঠোর হদিশ মেলে তাতেও কি নিরাপত্তা আছে? পদে পদে জড়িয়ে আছে ঝামেলা ঝক্কি। ডুয়ার্সের চা-সমাজের মেয়েরা, তাদের সংখ্যাটা যা-ই হোক না কেন তাদের জীবন আজ নিশ্চয়তাশূন্য। কোন ভবিতব্য যে তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে তারা কেউ জানে না।

বন্ধ চা-বাগানের এই ছবিতে আজ আর আড়াল নেই। ওদের কান্নায় ডুয়ার্সের মাটি ভিজে গিয়েছে। কে দেবে মুছিয়ে ওদের চোখের জল? তাই ফুল ফুটলেও ডুয়ার্সের ফাগুনে এবার বসন্ত নেই। বসন্ত পঞ্চমীতে নেই দোল উৎসবের লগন। হোলিতেও নেই কোনও খুশির রং।

সমাজে শ্রীমতী

মীনাক্ষীর কিশলয় ত্রিশ বছর ধরে মহীরূহ তৈরিতে ব্রত

স্কুলের গেট পেরিয়ে ঢুকতেই ছোট্ট ছোট্ট লাল-সাদা ফুলের মতো একঝাঁক প্রজাপতি যেন উড়ে এল। নিমেষের মধ্যে উঠোন ছেয়ে ফেলল। গেটের কাছে অভিভাবক, ভ্যান রিকশা— এসব দেখে বুঝলাম ছুটি হয়েছে। ভিতরে যেতেই প্রধান শিক্ষিকা এগিয়ে এলেন। তাঁর ঘরের দিকে যেতে যেতেই দেখলাম শিক্ষিকারা যে যার শ্রেণির শিশুদের নিয়ে ব্যস্ত। কোনও দিকে তাকাবার ফুরসত নেই তাঁদের। প্রধান শিক্ষিকা তথা 'কিশলয়' শিশুবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মীনাক্ষী ঘোষ ঘুরে ঘুরে দেখালেন তাঁদের ক্লাসরুম। বোর্ডের উপর রঙিন চকের আঁকিবুকি কাটা, তারই সঙ্গে অক্ষর আর সংখ্যার সমাবেশ।

জলপাইগুড়ির সেন্ট্রাল গার্লস' স্কুলে পড়ার সময় থেকেই 'শিশুনিকেতন' স্কুলটি তাঁকে টানত। সবুজ মাঠ, তাতে ফুটে থাকা রঙিন ফুল, সারা মাঠ জুড়ে খেলে বেড়াচ্ছে একদল শিশু। স্বপ্ন দেখার শুরুটা এভাবেই। বড় হয়ে ওইরকম একটা স্কুল বানাতে হবে। বিয়ের পর মালবাজারে গিয়ে দেখলেন ছোটদের কোনও স্কুল নেই। ১৯৮৭ সালের কথা। ১৫ জন শিশু নিয়ে গড়ে উঠল 'কিশলয়'। ছোট ছোট সুন্দর ছড়া জোগাড় করে তার মাধ্যমে শিশুদের মনের ভিতর প্রবেশ করতে লাগলেন মীনাক্ষী। পড়াশোনার পাশাপাশি শেখাতে লাগলেন নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি, যাতে সুস্থ মানসিক বিকাশ হয় তাঁর বিদ্যালয়ের সন্তানদের।

মালবাজারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিশেষত নানান দিবস উদ্‌যাপনে ডাক পড়ে 'কিশলয়'-এর। সব অনুষ্ঠানেই অংশ নেয় শিশুরা। দোলের দিন তুমুল উদ্দীপনায় আবিরের রঙে একাকার হয়ে যায় ছোট-বড় সবাই। একটা একটা করে বছর পেরিয়ে আজ তিরিশের দোরগোড়ায়। আর পনেরো এখন হয়ে গিয়েছে সাড়ে চারশো। ছাত্রছাত্রী সামলাতে তৈরি হয়েছে নতুন ঘর, নতুন শৌচাগার, লাগোয়া একটি মাঠে চলে ড্রিল, পিটি আর খেলাধুলার ক্লাস। সব মিলিয়ে একটা প্রাণবন্ত শিশুবিদ্যালয়। নিজের হাতে তিলে তিলে গড়ে তোলা কিশলয়ের জন্য তৃপ্তির হাসি উপচে পড়ছিল মীনাক্ষী ঘোষের মুখের প্রতিটি রেখায়।

স্কুলটিকে প্রাণ দিয়ে আগলে রাখার পরও নানান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন মীনাক্ষী। আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক নিয়ম করেই মনের আনন্দে চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁর আবৃত্তি শেখানোর প্রতিষ্ঠান 'সৃজনী'। সেখানেও ভালবাসা দিয়ে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন বয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে।

এত কিছুর পরও একটি বিষয় কিন্তু তাঁকে কষ্ট দেয়। ছোটবেলা থেকে আবৃত্তি শিখে একটি উচ্চতায় পৌঁছে অনেক ছাত্রছাত্রীই যখন চর্চা থেকে পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়, তখন হতাশ হন তিনি। সম্ভাবনাময় একটি ভবিষ্যতের মৃত্যু শিক্ষিকা হিসেবে মেনে নিতে পারেন না মন থেকে। সেদিক থেকে 'কিশলয়' তাঁকে দু'হাত ভরে দিয়েছে। কত ছাত্রছাত্রী দেশ-বিদেশে আজ প্রতিষ্ঠিত; তারা যখন এসে প্রণাম করে, স্কুলের কুশল জিজ্ঞাসা করে, তখন প্রাণ-মন ভরে ওঠে। মীনাক্ষী ঘোষের নিজের একমাত্র ছেলে, এমনকি পুত্রবধূও এই কিশলয়-এরই প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী। তাঁরা দেশের বাইরে থেকেও স্কুলের উন্নতিকল্পে সহযোগিতার হাত সব সময়ই বাড়িয়ে রেখেছেন।

১৯৮৭ থেকে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা, বাধাবিপত্তির পথ অতিক্রম করে আজ তাঁর মুখে বিজয়ীর হাসি। তবে শতকরা একশো ভাগই যে সন্তুষ্ট, তাও নন। 'এখন ডুয়ার্স'-এর তরফ থেকে মীনাক্ষী ঘোষের কিশলয়ের ছোট্ট শিশুদের জন্য রইল শুভেচ্ছা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা।

ডুয়ার্সের ডিশ

চিঁড়ার ছ্যাকা

উপকরণ: চিঁড়ে, কচুপাতা, পেঁয়াজ ও রশুন বাটা, কাঁচা লংকা বাটা, গরম মশলা এবং ঘি।

প্রণালী: চিঁড়ে জলে ভিজিয়ে খানিকক্ষণ রেখে ভেজা চিঁড়ে চিপে ছড়িয়ে রাখুন। এবার কচুপাতা বেটে তার সঙ্গে পেঁয়াজ, রশুন বাটা ও কাঁচা লংকা বাটা দিয়ে মিশ্রণ বানিয়ে রাখুন। উনুনে বসানো কড়াই গরম হলে তেল দিন। গরম তেলে ওই মিশ্রণ স্বাদমতো নুন দিয়ে ভাল করে কষাতে থাকুন, যতক্ষণ না লেইটা লালচে হয়ে ওঠে। এর পর ভেজা চিঁড়ে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। এবার ওই ভেজা চিঁড়ে কড়াইতে দিয়ে আবার কষাতে থাকুন। চিঁড়ে থেকে সামান্য জল বেরবে, তার সঙ্গে আরও একটু জল দিয়ে পুরো রান্নাটিকে খানিকক্ষণ ফুটিয়ে নিতে হবে। নামানোর সময় ঘি, গরম মশলা দিলে স্বাদ ও গন্ধ আরও ভাল হবে। সকাল কিংবা বিকেলের টিফিনে চামচ দিয়ে চিঁড়ের ছ্যাকা খেতে দারুণ।

মমতা রায়, নয়াপাড়া, ময়নাগুড়ি

শখের বাগান

বাড়ির টবে অ্যালোভেরা

ভেষজ নানা গাছ প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই বিনা যত্নেই বড় হয়। বাসক, কালমেঘ, তুলসী বাড়ির আনাচকানাচে একবার লাগালে আর চিন্তা নেই। আপনার ভেষজ উদ্যানের জেল্লা অনেকটাই বাড়বে, যদি আপনি অ্যালোভেরার কিছু চারা একবার লাগাতে পারেন। টব, গামলা, পুরনো বালতিসহ যে কোনও পাত্রেই সুন্দর, রসালো বহুবর্ষজীবী এই গাছ বেঁচে থাকে। রাসায়নিক সার বা কীটনাশক প্রয়োগের দরকার নেই। পাতা-পচা সার ও গোবর সার দেওয়া যেতে পারে। বছর বছর চারা কিনতে হবে না; বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখবেন মূল গাছের পাশ থেকে ছোট নতুন চারা বেরিয়েছে। সাবধানে আলাদা করে নতুন পাত্রে বা জমিতে বোনা যেতে পারে অ্যালোভেরা।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

টেক টক

অনলাইন ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধে-অসুবিধে

বিভিন্ন সময়ে হঠাৎ করে ট্রেনে বা প্লেনে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন আপনার হয়েই থাকে। লাইনে না দাঁড়িয়ে বাড়িতে বসেই আপনি টিকিটের অবস্থান যেমন দেখে নিতে পারেন, তেমনি বাড়িতে বসেই আপনি টিকিট কেটেও নিতে পারেন। প্রয়োজন শুধু ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর। যে কোনও অনলাইন শপিং-এও প্রয়োজন এই ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং। তাই যাঁরা ইতিমধ্যেই ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহার করছেন এবং যাঁরা করতে চাইছেন, তাঁদের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি এবং সুবিধা-অসুবিধাগুলি জেনে রাখা দরকার।

অনলাইন ব্যাঙ্কিং, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ই-ব্যাঙ্কিং (ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্কিং) বা ভার্চুয়াল ব্যাঙ্কিং— একই পরিষেবার বিভিন্ন নাম। নানা রকমের পদ্ধতি, কিন্তু মূলত সব ক'টি একই কাজ করে। এর দ্বারা গ্রাহকরা ব্যাঙ্কে না গিয়েও ইন্টারনেট ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলি যে কোনও দূরবর্তী স্থান থেকে করে নিতে পারেন। নিজস্ব অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়া, কাউকে টাকা পাঠানো, শপ পেমেন্ট করা, নিজের অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট চাওয়া ইত্যাদি অনেক বিষয়েই ব্যাঙ্কে যাওয়ার প্রয়োজন এখন অনেক কমে গিয়েছে। এই অনলাইন ব্যাঙ্কিং-এর কারণে প্রত্যেকটি বিষয়ের যেমন সুবিধা থাকে, তেমনি অসুবিধাও থাকে। বুঝে নেওয়া যাক এর সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলি।

প্রথমে সুবিধার দিকগুলি—

● এটা সাধারণ নিরাপদ, কিন্তু দেখে নিতে হবে, যে ওয়েবসাইটটি আপনি ব্যবহার করছেন, সেটির ভ্যালিড সিকিয়োরিটি সার্টিফিকেট আছে কি না। এটা আপনাকে জানতে সাহায্য করবে যে, সাইবার থিভ-দের হাত থেকে আপনার ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক তথ্য নিরাপদ থাকছে কি না।

● এটা খুব সহজেই খোলা যায় আর সাবলীলভাবে ব্যবহার করা যায়। কম্পিউটার জানা থাকলে ও ইন্টারনেট ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থাকলে আলাদা করে কোনও ট্রেনিং-এর প্রয়োজন নেই।

● ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর কোনও নির্দিষ্ট সময়সূচির ব্যাপার নেই। দিনে ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৭ দিন যে কোনও সময় যে কোনও জায়গা থেকে আপনি ব্যাঙ্কিং-এর কাজ করতে পারেন, শুধু নেট অ্যাক্সেস করা যায় এমন একটা ডিভাইস থাকতে হবে আপনার কাছে।

● ব্যাঙ্ক যদি আপনার বাড়ির কাছেও থাকে, তবু অনলাইন ব্যাঙ্কিংই হবে আপনার প্রথম পছন্দ। কারণ ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে আপনাকে দীর্ঘ লাইন দিতে যেমন হবে না, তেমনি দ্রুতবেগে ফান্ড ট্রান্সফার বা মানি ট্রান্সফার বা পেমেন্ট হয়। আবার অতটাই দ্রুতবেগে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে চলে যায় এবং সেটির কনফার্মেশনও দেখায়। তা ছাড়া যেহেতু ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে একসঙ্গে একাধিক অ্যাকাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার/মানি ট্রান্সফার/পেমেন্ট করা যায়, সেহেতু সময়ের অপচয় প্রায় হয়ই না।

● আপনি চাকরিজীবী হোন বা ব্যবসায়ী, আপনি যখন দরকারি কাজে বাইরে থাকেন বা বেড়াতে গিয়ে থাকেন, তখনও আপনাকে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিয়েই চলে নিরন্তর। বিশেষ করে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা অত্যন্ত কার্যকরী।

● আমাদের অনেকেরই একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-এর পরিষেবা বিভিন্নরকম হয়ে থাকে এবং সবারই কিছু বিশেষত্ব থেকে থাকে। এই তুল্যমূল্য বিচার করার সুযোগটাও আপনি অনলাইন ব্যাঙ্কিং-এ পেয়ে থাকেন। যেমন হাউস বিল্ডিং লোনের সুদ একেক ব্যাঙ্কে একেকরকম, আবার ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ ও সুযোগ-সুবিধাও একেক ব্যাঙ্কে একেকরকম হয়ে থাকে। আপনার কোনটি পছন্দ, তার বিচার করার সুযোগ আপনাকে করে দেয় ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, কারণ বাড়িতে বসে আপনি একই সঙ্গে সব ক'টি বিকল্প দেখার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন।

● ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর সব চাইতে বড় সুবিধা হল নিজের অ্যাকাউন্টের উপর নজরদারি করা। সেভিংস/সিসি/কারেন্ট বা ওডি অ্যাকাউন্ট এতে অনেকটাই নিরাপদ। ফান্ড ট্রান্সফার, বিল পেমেন্ট, ইএমআই পেমেন্ট, লোন স্টেটাস, রেকারিং ডিপোজিট ইত্যাদি আপনি সব সময়ই নিজের নখদর্পণে রাখতে পারেন এর মাধ্যমে।

● বর্তমানে কম্পিউটার ছাড়া মোবাইল ফোন থেকেও আইএমপিএস (ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস)-এর মাধ্যমে অনলাইন করা যায়, ফলে আরও বেশি করে অনলাইন ব্যাঙ্কিং আওতার মধ্যে চলে এসেছে। এখন আর আপনাকে ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্কিং বা ফান্ড ট্রান্সফারের জন্য কম্পিউটার বা ল্যাপটপ নিয়ে ঘুরতে হবে না। তা ছাড়া মোবাইলেই ইনবিল্ট ইন্টারনেট অ্যাকসেস ফ্যাকাল্টি থাকার দরুন মোবাইলের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং অ্যাকসেস করার জন্য আলাদা ইন্টারনেট কানেকশন বা ইন্টারনেট মোডেম ডিভাইস সঙ্গে রাখার প্রয়োজন হয় না।

● বিভিন্ন ব্যাঙ্ক নিজেদের অনলাইন পরিষেবাকে আপনার পকেট অবধি পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যসহ মোবাইল অ্যাপ (মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন) তৈরি করে দিয়েছে, যাকে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবা আরও সহজ ও সুলভ করে তুলেছে। আইএমপিএস পরিষেবা নিয়ে বিশাল আলোচনার অবকাশ রয়েছে, তাই এই নিয়ে পরের সংখ্যায় বিশদে আলোচনা করব।

জয়ন্ত ভৌমিক

তক্কাতক্কি

পোশাক আধুনিক হোক, রুচি মার্জিত হওয়া বেশি জরুরি

পোশাক-আশাক অবশ্যই রুচিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। পোশাক ছোট না বড়, তার চাইতেও বড় কথা, সেটি অপরের চোখে রুচিসম্মত কি না। কথায় বলে, 'আপ রুচি খানা, পর রুচি পহননা'। তার মানে অন্যের চোখে আমাকে কীরকম লাগবে, সেই অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। এর অর্থ এও নয় যে, সব সময় বা সব পরিবেশেই শাড়ি অথবা অন্য কোনও পোশাকে নিজেকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করতে হবে। জিন্‌স-টি-শার্ট কিংবা স্কার্ট-টপ পরেও অত্যন্ত মার্জিত থাকা যায়। তবে হ্যাঁ, ধর্ষণের কারণস্বরূপ কখনওই পোশাককে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত নয়। ধর্ষকরা যে ধরনের অস্বাভাবিক, তাতে তাদের কাছে যে কোনও পোশাকের মহিলাই নিরাপদ নয়। যথেষ্ট রুচিসম্মত পোশাক পরেও বহু মেয়ে ধর্ষিত হয়। শুধু ধর্ষিতই হয় না, খুনও হয়ে যায়। ধর্ষকের উত্তেজনার মাত্রা যদি এতটাই অতিরিক্ত হয় তাহলে তার কাজকে কি কোনও কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়? শিশু থেকে বৃদ্ধা কেউই রক্ষা পায় না এমন অস্বাভাবিক পুরুষের হাত থেকে। তাদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পোশাক তেমন একটা উত্তেজকের কাজ করেনি বলেই আমার ধারণা। ফলে এ কথা বলা যেতেই পারে যে, মেয়েদের ছোট পোশাক কখনওই ধর্ষণের কারণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না।

রেশমী দত্ত, বানারহাট

হোলিতে রং খেলবেন সাবধানে

আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন করলে দোলে ক্ষতিকারক রঙের হাত থেকে অনায়াসেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব। রং খেলার উন্মাদনায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে যেন আমরা নজর দিতে ভুলে না যাই।পরামর্শ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের।

❑ দোল খেলতে বেরনোর মিনিট দশেক আগে মুখে সানস্ক্রিন এবং ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নিন।

❑ খেলতে যাওয়ার আগে মাথার স্কাল্পে এবং চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত প্রতিটি অংশে ভাল করে নারকেল তেল অথবা ক্যাস্টর অয়েল মেখে নিতে হবে। তাহলে কোনও ক্ষতিকর রাসায়নিক, ধুলো, আবির ইত্যাদি থেকে সরাসরি চুলের বা মাথার ক্ষতি হবে না।

❑ ঠোঁটের উপর কোনও লিপ জেল অথবা গাঢ় করে লিপস্টিক লাগিয়ে নিন।

❑ রং খেলার পর ভুলেও রোদ্দুরে বসে থাকবেন না। এতে চামড়ার ক্ষতি তো হয়ই, সেই সঙ্গে রং তুলতেও কষ্ট হয়। বাইরে রং খেলুন, কিন্তু খেলা শেষে বিশ্রাম নিন ছায়ায়।

❑ রং পছন্দ করার ক্ষেত্রেও হারবাল কালার হলে ভাল হয়। যেমন হেনা বা পালংপাতা থেকে তৈরি সবুজ, খাওয়ার হলুদ কিংবা গাঁদা ফুলের গুঁড়ো থেকে হলুদ রং, টম্যাটো কিংবা বিটরুট থেকে টকটকে লাল এবং চা থেকে বাদামি রং। এসব বাজারে কিনতে পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু সঠিকটা চিনে নেওয়া চাই। এদের দামও একটু বেশি হয়।

❑ খেলার পর খুব বেশি ক্ষার আছে এমন সাবান ব্যবহার না করে একটু মাইল্ড সোপ দিয়ে তিন-চারবার ঘষে স্নান করুন। সাবানের বদলে ক্লিনজিং মিল্কও ব্যবহার করতে পারেন। সমস্ত স্কিনে ক্লিনজিং মিল্ক লাগিয়ে হালকা নরম কাপড় অথবা তুলো দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

❑ স্নান করার পর সারা শরীরে নারকেল তেল কিংবা ময়শ্চারাইজার অথবা অন্য কোনও বডি লোশন লাগাতে ভুলবেন না।

❑ চুল পরিষ্কার করার সময় প্রথমে শুধু জলে মাথাটা ধুতে হবে। এতে আলগা লেগে থাকা আবির কিংবা ধুলো কিংবা গুঁড়ো রং সহজেই বেরিয়ে যাবে। কিন্তু মাইকা লেগে থাকবে স্কাল্পে।

❑ মাইকা বা কঠিন রং ধোয়ার জন্য হালকা ধরনের শ্যাম্পু চুলের একেবারে গোড়ায় এবং মাথার চামড়ায় ভালভাবে আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো করে ঘষতে হবে, যাতে সমস্ত রং পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। পুরো প্রক্রিয়াটি দু'-তিনবার প্রয়োগ করতে হবে।

❑ এক মগ জলে একটি গোটা পাতিলেবু চিপে সেই জলটা দিয়ে মাথা ধুয়ে নিলে স্কাল্পের অ্যাসিড-অ্যালকা ব্যালান্স আবার ঠিকঠাক ফিরে আসে।

❑ চুলে শ্যাম্পু করার পর অবশ্যই কন্ডিশনার লাগাবেন।

❑ দোল খেলতে নামার আগে সব থেকে ভাল হয় চুলে একটা স্কার্ফ বেঁধে নেওয়া।

❑ রং খেলার সময় ফুলহাতা জামা এবং পুরো পা-ঢাকা পোশাক পরাই ভাল। তাতে অন্তত চামড়াকে কিছুটা রক্ষা করা যাবে।

❑ হোলির অন্তত দু'-তিন দিন আগে থেকে কোনওরকম স্কিন ট্রিটমেন্ট করাবেন না। যেমন— ওয়াক্সিং, ফেশিয়াল, স্পা ইত্যাদি করাবেন নিদেনপক্ষে দিন সাত-দশেক আগে।

চোখ

❑ কনট্যাক্ট লেন্স পরে কখনওই রং খেলবেন না।

❑ সানগ্লাস ব্যবহার করলে ভাল হয়। মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

❑ চোখে যদি কোনও কারণে রং ঢুকে যায়, ভুলেও চোখ ঘষবেন না। এতে আরও বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে।

❑ খেলতে যাওয়ার আগে চোখের আশপাশ দিয়ে আলতো করে বেশ খানিকটা নারকেল তেল মেখে নিন, যাতে রং লাগলেও তা বসে না যায়।

❑ চোখ ধোয়ার সময় চুল ভাল করে বেঁধে নিন, যাতে চুল থেকে রং এসে চোখে না পড়ে।

❑ চোখ ধোয়ার আগে আরও খানিকটা ক্রিম লাগিয়ে সেটি ভাল করে হালকাভাবে ঘষে নিন, তাতে রং আলগা হয়ে যাবে।

❑ খেলার সময় অনুরোধ করুন, যাতে চোখে রং না যায়।

সবশেষে বলা উচিত, যাদের অ্যালার্জি আছে এবং যাদের স্কিন অত্যন্ত সেনসিটিভ, তাদের জন্য রং খেলা বাঞ্ছনীয় নয়।

উল্লাস যেন নিয়ন্ত্রণ না হারায়

আমাদের ডুয়ার্সে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। তবে এখন ভাবনা হয়। সব উৎসবেই আনন্দের পাশাপাশি একটা বেদনার দিকও চোখে পড়ছে। সেটা ক্রমশই একটা চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই দোল নিয়েও ভাবনা একটু থেকেই যাচ্ছে। বসন্তের মাতাল সমীরণে সবাই মেতে উঠবে — এটাই তো কাম্য। জাতি-ধর্ম-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রং দেওয়া-নেওয়াটাই সব থেকে আনন্দের। রঙের উচ্ছ্বাসে প্রীতি আর শুভেচ্ছা বিনিময় ঘটলেই সেটা উৎসব। উল্লাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ হারালে ছন্দ কেটে যেতে বাধ্য। তখন তা আর খুশির তালে এগতে চায় না কিছুতেই। ক্রমে তা অন্য দিকে মোড় নেয়। কিন্তু সেটা তো কারও কাম্য নয়।

আজকাল যুবসমাজে নানা ঘটনার মধ্যে বড্ড অসহিষ্ণুতা চোখে পড়ে। যা থেকে অনেক সময়ই কোনও না কোনও তিক্ত পরিবেশ, এমনকি প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটে যায় খুব সহজে। শুধুমাত্র ক্রোধ কিংবা হিংসার জেরে এত বড় দুর্ঘটনা উৎসবের দিনেও ঘটে যায়। হোলিতে রং মাখানোর মধ্যে যে আনন্দ, যে তৃপ্তি আছে তা আমাদের দূরকে কাছে টানার প্রেরণা জোগায়। আমরা অনেক অচেনা-অজানা মানুষকেও সে দিন রাঙিয়ে দিয়ে ভালবাসার উষ্ণতা উপহার দিই। তাই সে দিনটা বড্ড সুখের দিন। সে দিন এমনটা কিছুতেই চাই না, যা দুঃখজনক।

মেয়েরা আজকাল কোথাও নিরাপদে নেই। সমাজের মধ্যে এমন সব হিংস্র পাশবিক ঘটনার উদাহরণ রয়েছে, যা পশুদেরও লজ্জা দেবে। সেইসব আক্রমণকারী যেন ওত পেতেই রয়েছে। তাদের থাবা থেকে নিস্তার নেই কোথাও। দোলে রং মাখানোর অছিলায় শ্লীল-অশ্লীলের তফাত হারিয়ে ফেলে অনেকেই। এমনটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। শরীর-মন সবকিছুর মধ্যেই সামঞ্জস্য ও নিয়ন্ত্রণ খুব জরুরি। দোলে রং তো খেলতেই হবে। সে খেলা হোক নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে। রং লাগুক সবার মনেপ্রাণে। উৎসবে মেতে উঠুক সব্বাই।

শর্বরী দত্ত, পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি

মনের ভিতর এমন অনেক কথা জমে উঠছে যা কারুর সঙ্গে শেয়ার করলে হালকা লাগবে। জানান আমাদের। প্রয়োজনে নাম ও ঠিকানা গোপন রাখা হবে। লেখাটি যেন ২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা— **'মেঘপিয়োন', 'শ্রীমতী ডুয়ার্স বিভাগ', প্রযত্নে- 'এখন ডুয়ার্স', মুক্তাভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১ অথবা ই-মেল করুন— srimati.dooars@gmail.com**

EKHON DUARS, Vol-2, Issue-12/2, WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় রংরুটের বই। পাওয়া যাবে 'এখন ডুয়ার্স' স্টলে। ১১-২০ মার্চ

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় এবার প্রকাশিত হচ্ছে এখন ডুয়ার্স-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন।

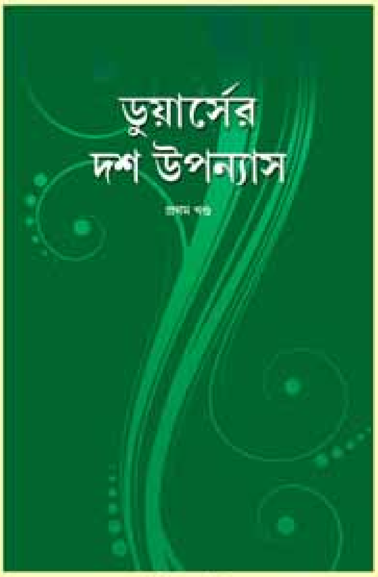

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা।

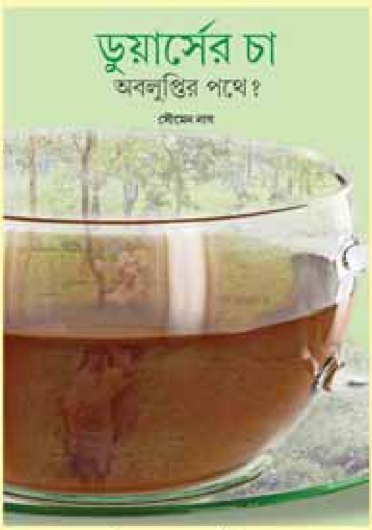

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ
মূল্য ১৫০ টাকা।

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান
আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

পাসপোর্ট প্রতিবেশীদের পাড়ায়
দীপিকা ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
মূল্য ২০০ টাকা

আমাদের পাখি
তাপস দাশ, উজ্জ্বল ঘোষ
মূল্য ১০০০ টাকা, বইমেলায় ৬৯০ টাকা

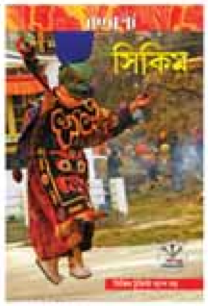

রংরুট সিকিম। রংরুটে প্রকাশিত সিকিম সম্পর্কিত রচনার সংকলন দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। সঙ্গে সিকিমের পূর্ণাঙ্গ টুরিস্ট ম্যাপ।
মূল্য ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

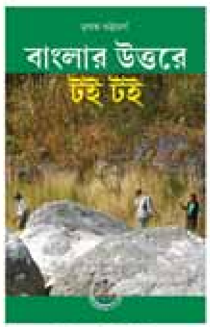

বাংলার উত্তরে টই টই
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মূল্য ১০০ টাকা।

আমেরিকার দশ কাহন
আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড
শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

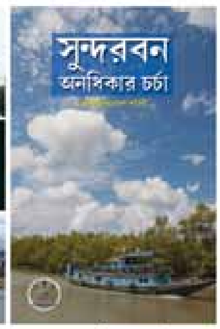

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
মূল্য ১৫০ টাকা

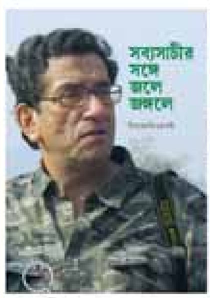

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী
সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি
মূল্য ১৫০ টাকা

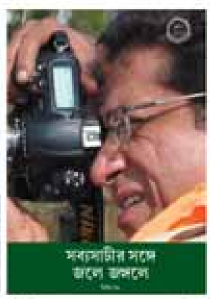

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুট পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক পর্যটন গাইড
মূল্য ১০০ টাকা

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.